দেবী চৌধুরানী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

4·4

বঙ্কিম-গ্রন্থমালা'র ২নং গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের

714

দেবী চৌধুরাণী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

ଉପହାର
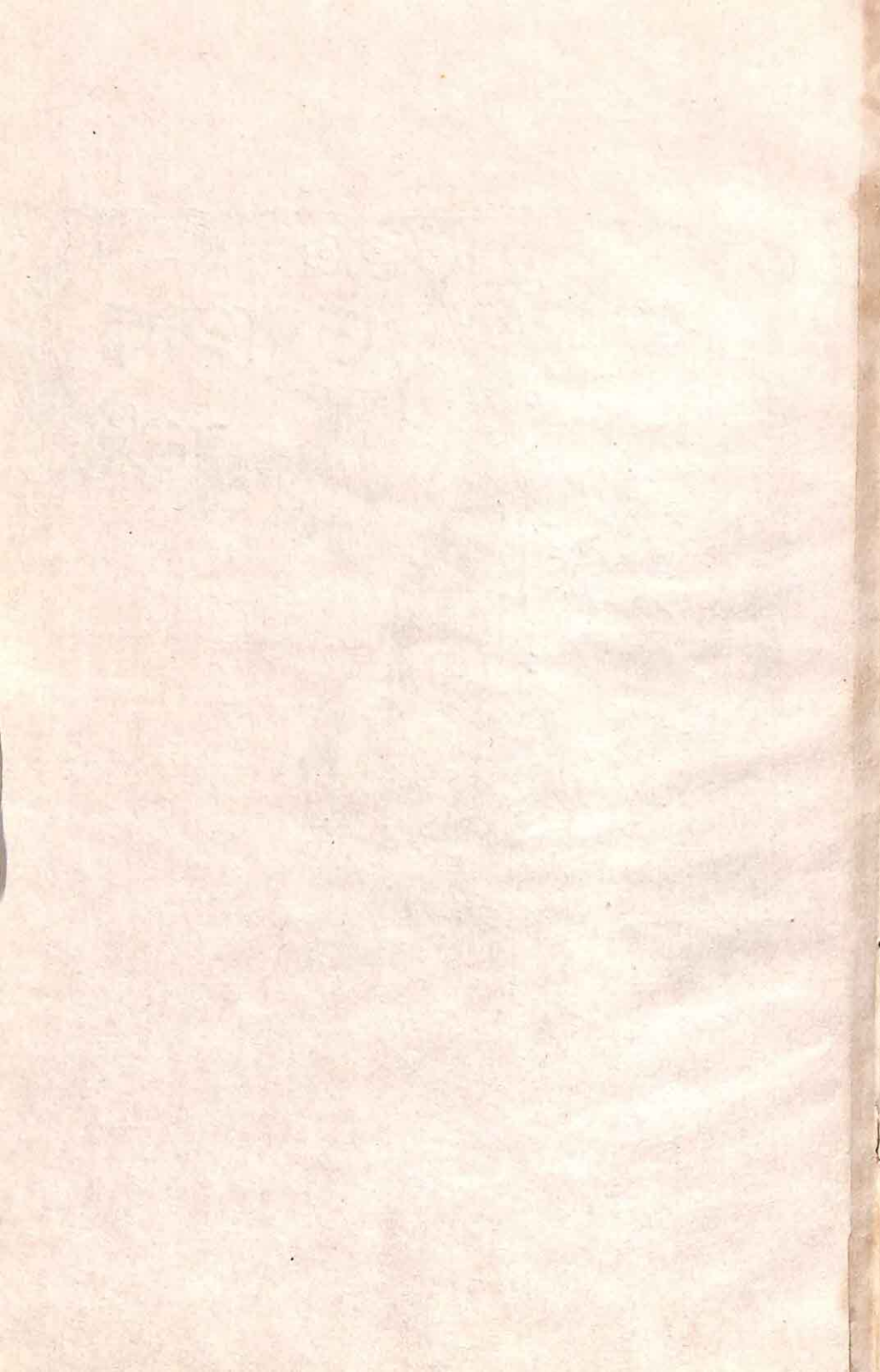
এ কাহিনী সম্বন্ধে

'দেবী চৌধুরাণী' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নভেলগুলির অন্যতম। বাংলা-সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ বই।

এই কাহিনী প্রথমে 'বঙ্গদর্শন'-কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সেখানে সম্পূর্ণ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র পরে বই আকারে সম্পূর্ণ ক'রে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশ করেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ষষ্ঠ সংস্করণ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হ'লো।

দেবী চৌধুরাণীর অপূর্ব্ব জীবন ও চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র এই নভেল লেখেন। তোমরা বোধ হয় অনেকে জানো না যে, দেবী চৌধুরাণী কোনো কাল্পনিক নাম নয়। সত্যই দেবী চৌধুরাণী ব'লে একটি অসাধারণ মেয়ে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিল। এবং দেশের জন্যে এই মেয়েটি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল। বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের সরকারী-দফ্‌তর থেকে রঙ্গপুর জেলার যে প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশিত হয়, তাতে দেবী চৌধুরাণীর নামের উল্লেখ আছে। ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড সাহেব, ব্রেনান সাহেব প্রভৃতির নাম সেখানে উল্লিখিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই ঐতিহাসিক-বিবরণকে ভিত্তি ক'রে তাঁর কল্পনায় এই অপূর্ব্ব মেয়েটির জীবনকে নতুন ক'রে গড়ে তুলেছেন।

এই কাহিনী পড়বার আগে, সেই কথাটা আশা করি তোমরা স্মরণে রাখবে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়,—মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈয়ারি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন, নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কালেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটাল-পাড়াতেই বাস করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলে-বেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন। এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

মাত্র তের বৎসর বয়সে, তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন-অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয়-গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন,……বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাঁহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার "কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে-স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা…সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!
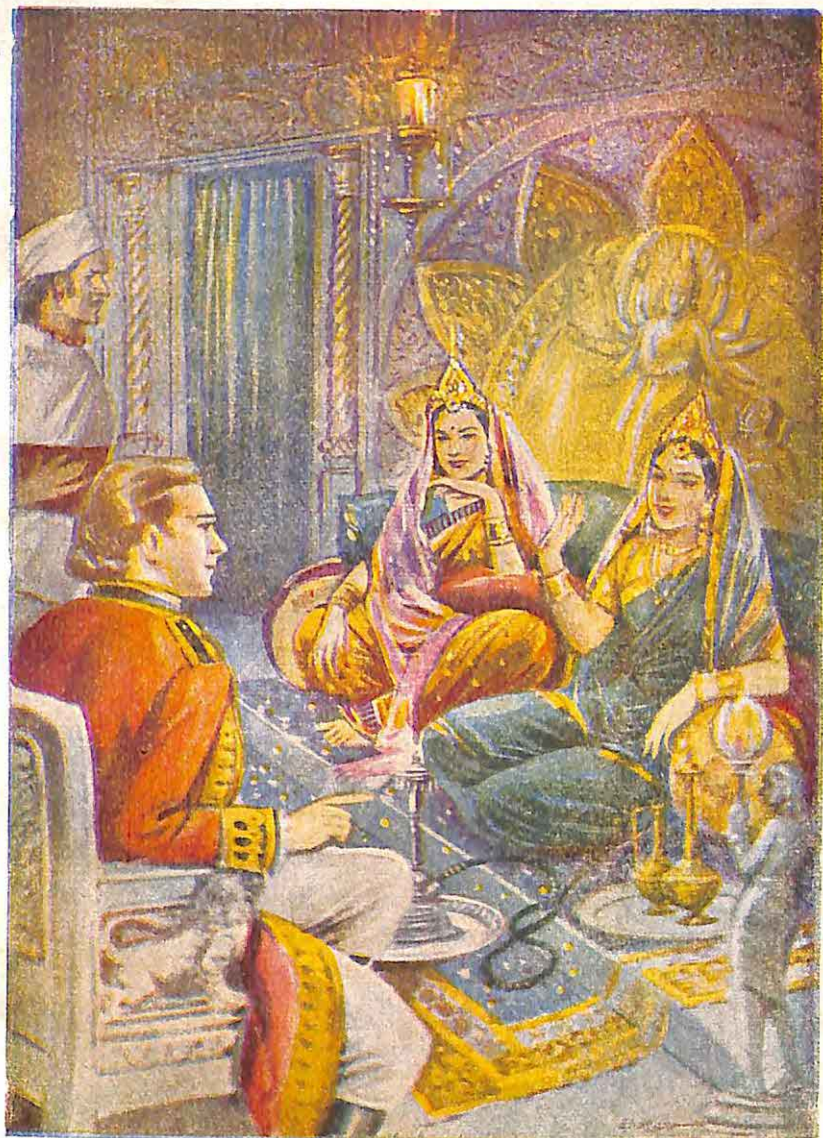
......নিশি বলিল, "সাহেব, ও আমার ভগিনী—ও প্রতারণা করিতেছে। চলুন, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন, যাইতেছি। আমিই দেবী রাণী......
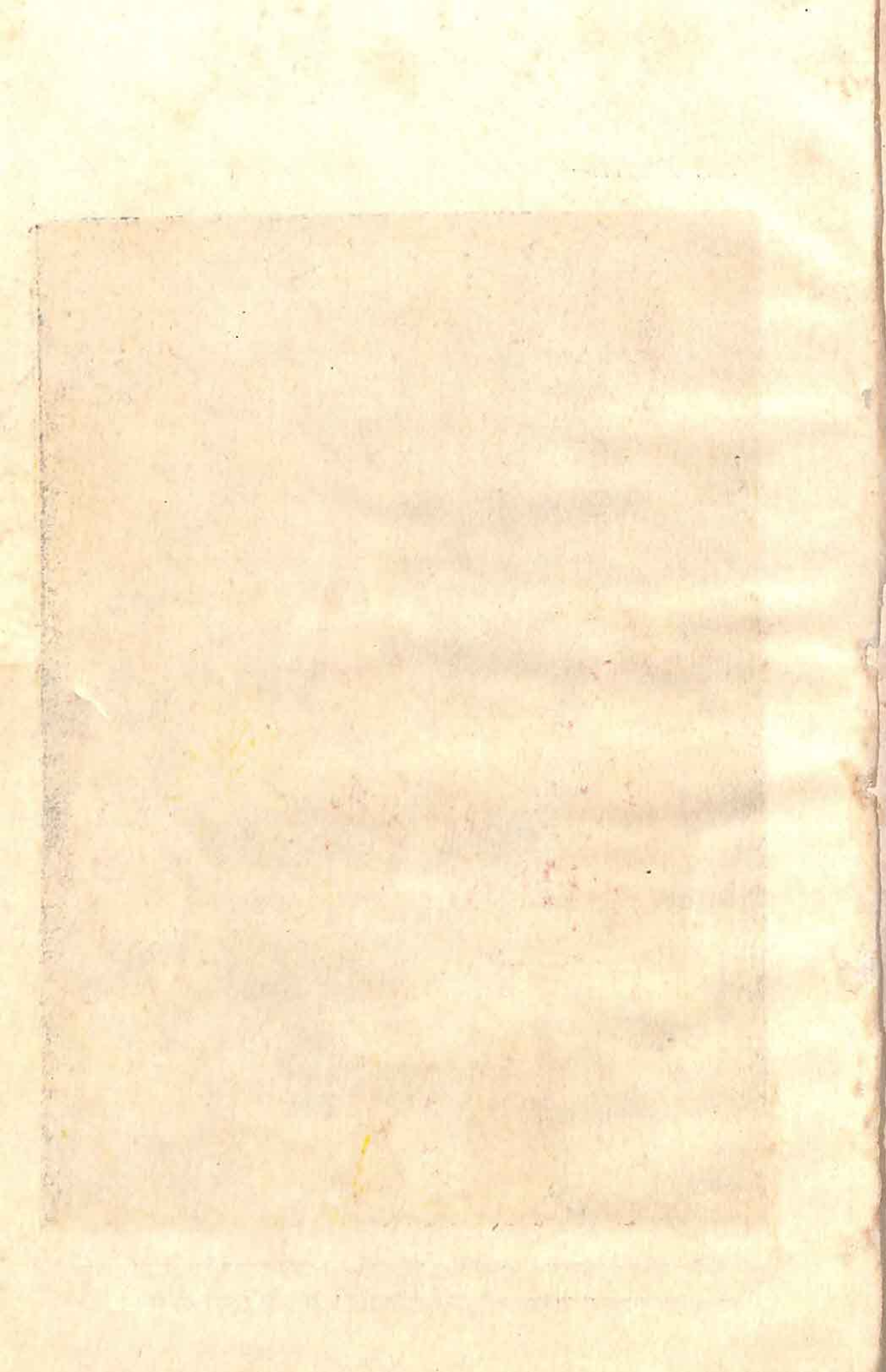
দেবী চৌধুরাণী

—:—

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী !"

"যাই মা ।"

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল ! বলিল, "কেন মা ?"

মা বলিল, "যা না—ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না ।"

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে ।"

মা। তবে খাবি কি ? আজ ঘরে যে কিছু নেই ।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা ?

মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি। কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা কি ?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, "তুই তবে ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই ।"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার মাথা খাও, আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুন আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেয়েমানুষের তাই ঢের ।"

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়াছিল, মা চাল ধুইতে গেল।

চাল ধুইবার জন্য ধুচুনী হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, "চাল কই ?" প্রফুল্লকে দেখাইল, আধমুঠা চাউল আছে মাত্র —তাহা একজনেরও আধপেটা হইবে না।

মা ধুচুনী হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, "কোথা যাও ?"

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নইলে শুধু ভাতই কপালে জোটে কই ?

তখন প্রফুল্ল মার হাত হইতে ধুচুনী কাড়িয়া লইয়া তফাতে রাখিল। বলিল, "মা, আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে ?"

মা চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল, "সবই ত আছে মা— কপালে ঘটিল কই ?"

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না ?

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলে, এই অপরাধ—আর তোমার কপাল। নহিলে তোমার অন্ন খায় কে ?

প্র। শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে, তবে খাইব—নইলে আর খাইব না। তুমি চেয়ে-চিন্তে যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও, খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আইস।

মা। সে কি মা! তারা যে কখনও তোমার নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি ?

মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমাকে একা

রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—কিন্তু আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ কমিবে, এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।”

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মা বুঝিল যে, মেয়ের পরামর্শ ই ঠিক। তখন মা, যে কয়টি চাউল ছিল, তাহা রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, “তবে আর বেলা কাটাইয়া কি হইবে? অনেক পথ।”

তাহার মাতা বলিল, “আয় তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।”

প্রফুল্ল বলিল, “না থাক।”

মা ভাবিল, “থাক! আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।”

তখন দুই জনে মলিন বেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভবাবু খুব বড়মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে, দোতলা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ী, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কিতে বাগান, পুকুর প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাতা ও কন্যা অনশনে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রবেশকালে প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়াও ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এদিকে প্রফুল্লের

মা, কন্যা বড়মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক্ কুলান করিতে পারিল না। বরযাত্রদিগের লুচি, মণ্ডায় উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যাযাত্রগণের কেবল চিড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রেরা অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মার সঙ্গে তাঁহাদের কোন্দল বাঁধিল, প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল। প্রতিবাসীরা একটা বড় রকম শোধ লইল। পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, 'আমরা জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাকস্পর্শে জলগ্রহণ করিব না।' হরবল্লভের মনে হইল যে, বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহবাড়ীতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন।

পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি আর কখনও তাহাদের সংবাদ লইলেন না; পুত্রকেও লইতে দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। তাই আজ সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মার পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন গৃহিণী অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ী, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে, সেখানে প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠার বৎসর।

গিন্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা?"

প্রফুল্লের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমরা কুটুম্ব।"

গিন্নী। কুটুম্ব? কে কুটুম্ব গা?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরাণী কাজ

করিতেছিল। সে দুই এক বার প্রফুল্লদিগের বাড়ী গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরেই। সে বলিল, "ওগো, চিনেছি গো! ওগো চিনেছি! কে! বেহান?"

গিন্নী। বেহান? কোন্ বেহান?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড় ছেলের বড় শাশুড়ী।

গিন্নী বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো।"

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গা?"

প্রফুল্লের মা বলিল, "তোমার বড় বউ।"

গিন্নী বিমর্ষ হইয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তোমরা কোথায় এসেছিলে?"

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়ীতেই এসেছি।

গিন্নী। কেন গা?

প্র, মা। তোমার বউ একা আসতে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে! কি জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বউ নিয়ে ঘর করতে পেলেম না!" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হইল। বলিলেন, "কি করব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নী আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা, বসো।"

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা—সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল, এ আবার কি? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "দ্বার দিলে কেন ?"

মেয়েটি বলিল, "কেউ না আসে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব, তাই !"

প্রফুল্ল বলিল, "তোমার নাম কি ভাই ?"

সে বলিল, "আমার নাম সাগর, ভাই।"

প্র। তুমি কে, ভাই ?

সা। আমি, ভাই, তোমার সতীন।

প্র। তুমি আমায় চেন নাকি ?

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিলাম।

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দূর, তা কেন ? পোড়া কপাল আর কি—আমি কেন সে হ'তে গেলেম ? আমার কি তেমনই দাঁত উঁচু, না আমি তত কালো ?

প্র। সে কি—কার দাঁত উঁচু ?

সা। কেন, যে ঘরণী গৃহিণী।

প্র। সে আবার কে ?

সা। জান না ? তুমি কেমন ক'রেই বা জানবে ? কখন ত এসো নি, আমাদের আর এক সতীন আছে, জান না ?

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর-এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করেছিলাম, সেই তুমি।

সা। না। সে সেই,—আমার ত তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিত ?

সা। রূপ দেখে আমার কান্না পায়!

প্র। তাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে ?

সা। না, তা নয়। আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান। তাই সেই টাকার জন্য—

প্র। বুঝেছি, আর বলিতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী। যে কুৎসিত, সে ঘরণী গৃহিণী হলো কিসে ?

সা। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে পাঠায় না ; আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের বড় বনে না। তাই আমি এখানে কখন থাকি না। কাজ কর্ম্মে কখন আনে। এই দুই চারি দিন এসেছি, আবার শীঘ্র যাব।

প্রফুল্ল দেখিল যে, সাগর দিব্য মেয়ে—সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না। প্রফুল্ল বলিল, "আমায় ডাকলে কেন ?"

সা। তুমি কিছু খাবে ?

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, "কেন, এখন খাব কেন ?"

সা। তোমার মুখ শুক্‌নো, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তৃষ্ণা পেয়েছে। কেউ তোমায় কিছু খেতে বল্‌লেন না। তাই তোমাকে ডেকেছি।

প্রফুল্ল তখনও পর্যন্ত কিছু খায় নাই। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু উত্তর করিল, "শাশুড়ী গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝ্‌তে। আমার অদৃষ্টে কি হয়, তা না জেনে আমি এখানে কিছু খাব না।"

সা। না না, এদের কিছু তোমার খেয়ে কাজ নাই। আমার বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ।

এই বলিয়া সাগর কতকগুলা সন্দেশ আনিয়া প্রফুল্লের মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। অগত্যা প্রফুল্ল কিছু খাইল। সাগর শীতল জল দিল, পান করিয়া প্রফুল্ল শরীর স্নিগ্ধ করিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমি শীতল হইলাম, কিন্তু আমার মা না খাইয়া মরিয়া যাইবে।"

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন ?

প্র। কি জানি ? বোধ হয়, পথে দাঁড়াইয়া আছেন।

সা। এক কাজ করব ?

প্র। কি ?

সা। ব্রহ্ম ঠানদিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব ?

প্র। তিনি কে ?

সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসি—এই সংসারে থাকেন।

প্র। তিনি কি করবেন ?

সা। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্র। মা এ বাড়ীতে কিছু খাবেন না।

সা। দূর! তাই কি বলছি ? কোন বামুন-বাড়িতে।

প্র। যা হয় কর, মার কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর চকিতের মত ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়া বলিল। ব্রহ্ম প্রফুল্লের মার সন্ধানে বাহির হইল। সাগর ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে সংবাদ দিল।

প্রফুল্ল বলিল, "এখন ভাই, যে গল্প করিতেছিলে, সেই গল্প কর।"

সা। গল্প আর কি ? আমি ত এখানে থাকি না—থাকতে পাবও না। তা, তুমি এয়েচ, যেমন করে পার, থাক।

প্র। থাকব বলেই ত এসেছি। থাকতে পেলে ত হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না।

প্রফুল্ল বলিল, "কপালে কি হয়, তাহা আগে জানিয়া আসি। তারপর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। কপালে যাই থাকে, একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। তিনি কি বলেন, শুনিয়া যাইব।"

এই বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। দেখিল, তাহার শাশুড়ী তাহার তল্লাস করিতেছেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া গিন্নী বলিলেন, "কোথা ছিলে মা ?"

প্র। বাড়ী ঘর দেখিতেছিলাম।

গিন্নী। আহা! তোমারই বাড়ী ঘর, বাছা—তা কি করব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল। বলিলেন, "আজ আর কোথায় যাইবে? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।"

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, "তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাতে একজন মানুষের একবেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব? আমি বাগ্দীই হই, মুচীই হই, তাঁহার পুত্রবধূ। তাঁহার পুত্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে?"

শাশুড়ী বলিল, "অবশ্য বলিব।" তারপর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্দী বেটী গিয়াছে কি?"

গৃহিণী। রাত্রে আবার সে কোথায় যাবে? রাত্রে একটা অতিথ এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বৌটাকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব?

কর্ত্তা। অতিথ হয়, অতিথশালায় যাক না? এখানে কেন?

গিন্নী। আমি তাড়াতে পারব না। তাড়াতে হয়, তুমি তাড়াও। বড় সুন্দর বৌ কিন্তু—

কর্ত্তা। বাগ্দীর ঘরে অমন দুটো একটা সুন্দর হয়। তা আমি তাড়াচ্ছি। ব্রজকে ডাক্ ত রে।

ব্রজ, কর্ত্তার ছেলের নাম। একজন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ বাইশ; অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ,—

পিতার কাছে বিনীত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু, তোমার তিন সংসার—মনে আছে?"

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

"প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাগ্দীর মেয়ে?"

ব্রজ নীরব। বাপের সাক্ষাতে—বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সে কালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মুর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে!

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "সে বাগ্দী বেটী—আজ এখানে এসেছে—জোর ক'রে থাকবে, তা তোমার গর্ভধারিণীকে বললেম যে, ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে? এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! বাবা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না, ওঁর কথা রাখতেই হইবে, আমার কথা কিছু চলিবে না? তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও।"

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা।" মার কথায় উত্তর দিল, "ভাল।"

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর একটু দাঁড়াইল। সেই অবকাশে গৃহিণী কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বৌকে তাড়াবে—বৌ খাবে কি করিয়া?"

কর্ত্তা বলিলেন, "যা খুসি করুক—চুরি করুক—ডাকাতি করুক—ভিক্ষা করুক।"

গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, "তাড়াইবার সময়ে বৌমাকে এই কথা বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে, একটি উপরে। নীচের ঘরে বসিয়া সাগর পান সাজিত, সমবয়স্কাদিগের সঙ্গে খেলা করিত, কি গল্প করিত। উপরের ঘরে রাত্রে শুইত, দিনমানে নিদ্রা আসিলে সেই ঘরে গিয়া দ্বার দিত।

ব্রজেশ্বর সেই উপরের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর একজন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথম স্ত্রী!

বড় গোল বাধিল। দুই জনে সম্বন্ধ বড় নিকট। কিন্তু কখনও দেখা নাই। কখনও কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? বিশেষ একজন তাড়াইতে আসিয়াছে, আর একজন তাড়া খাইতে আসিয়াছে।

প্রথম দুই জনের একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে প্রফুল্ল অল্প, অল্প মাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল।

ব্রজেশ্বর দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। তাহাকে শান্ত করিয়া ব্রজেশ্বর পিতার অভিপ্রায় জানাইল।

প্রফুল্ল বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "বেশ—আমি চলিলাম। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।"

ব্রজ। এখন যাইও না। আমি একবার কর্ত্তাকে বলিয়া দেখিব।

প্র। বলিলে কি তাঁর মন ফিরিবে?

ব্রজ। না ফিরুক, আমার কাজ আমায় করিতে হইবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া, আমি কি অধর্ম্মে পতিত হইব?

প্র। তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না, তাতে আমি সুখী হইব না।

ব্রজ। নিতান্ত পক্ষে, তিনি যাহাতে তোমার খোরপোষ পাঠাইয়া দেন, তা আমায় করিতে হইবে।

প্র। তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।

ব্রজ। আমার কিছুই নাই, কেবল আমার এই আঙ্গটিটি আছে। এখন এইটি লইয়া যাও। আপাততঃ ইহার মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হইবে। তার পর যাহাতে আমি দুপয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণপোষণ করিব।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনার অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরাকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে দিল। প্রফুল্ল আপনার আঙুলে আঙ্গটিটি পরাইতে পরাইতে বলিল, "যদি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও?"

ব্রজ। সকলকে ভুলিব—তোমায় কখনও ভুলিব না।

প্র। যদি এর পর চিনিতে না পার?

ব্রজ। ও মুখ কখনও ভুলিব না।

প্র। আমি এ আঙ্গটিটি বেচিব না—না খাইয়া মরিয়া যাইব, তবু কখন বেচিব না। যখন তুমি আমাকে না চিনিতে পারিবে, তখন তোমাকে এই আঙ্গটি দেখাইব। ইহাতে কি লেখা আছে?

ব্রজ। আমার নাম খোদা আছে।

দুইজনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিলে সাগর ও নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

নয়ান বলিল, "দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ?"

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথার উত্তর ?"

ন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, "কি করিয়া খাইবে ?" ঠাকুর বলিয়াছেন, "চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও।"

"দেখা যাবে" বলিয়া প্রফুল্ল বিদায় হইল।

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কী দ্বার পার হইল। সাগর পিছু পিছু গেল। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, "আমি, ভাই, আজ চলিলাম। এ বাড়ীতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ী গেলে, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেন ?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ী আসিল। প্রফুল্লের মার যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক। সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, বামনের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তারই উপর ডুবেলা স্নান, জুটিলে আহার পূর্ব্বমত চলিল। প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া কখনও কিছু দিত, তাইতে আহার চলিত। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল—শেষে প্রফুল্লের মা শয্যাগত হইল। সেকালে সেই সকল গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই

ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লের এমন লোক নাই যে, কবিরাজ ডাকে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল, শেষে প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইল।

পাড়ার পাঁচজন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মা'র সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা এসময় শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।

প্রফুল্ল একা। পাড়ার পাঁচজন আসিয়া বলিল, "তোমাকে চতুর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিল, "ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি—কিন্তু কোথায় কি পাইব?" পাড়ার পাঁচজন বলিল, "তোমায় কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।" কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল, এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

একজন প্রতিবাসী বলিল, "একটা কথা মনে হইতেছে। তোমার মার শ্রাদ্ধে তোমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?"

প্রফুল্ল বলিল, "কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে?"

দুইজন পাড়ার মাতব্বর লোক অগ্রসর হইল। সকল কাজে তাহারাই আগু হয়—তাহাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, "তোমরাই আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।"

তাহারা বলিল, "সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুই জন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কিন্তু হরবল্লভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর এ সকল শুনিল। মনে করিল, "একদিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব। সেই রাত্রেই ফিরিব।"

প্রতিবাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি

মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্পন্ন করিল। ব্রজেশ্বর যাইবার সময় খুঁজিতে লাগিল।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীন হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। কাছে শুইবার জন্য রাত্রে একজন স্ত্রীলোক চাই। ফুলমণিকে এজন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যেদিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেই দিন অবধি প্রফুল্লের বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়। তবে ফুলমণি লোক ভাল ছিল না। গ্রামের জমিদার পরাণ চৌধুরীর গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সে শ্রাদ্ধের পরদিন গভীর রাত্রে প্রফুল্লের মুখে কাপড় বাঁধিয়া জোর করিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে পরাণবাবু জমিদারের বাড়ীতে লইয়া চলিল।

ইহার অর্দ্ধ দণ্ড পরে ব্রজেশ্বর সেই শূন্য গৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বর সকলকে লুকাইয়া রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে। হায়! কোথাও কেহ নাই।

প্রফুল্লকে লইয়া বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল। শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ ছিল। বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখন কোন দেশে হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তখন দেশে অরাজকতা। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে, ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের

খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে?

অতএব দুর্লভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তাঁর উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পাল্কী দেখিয়া ডাকাতের আসা সম্ভব। সেই ভয়ে বেহারারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোকজনও নাই, কেবল দুর্লভ নিজে, আর ফুলমণি। এইরূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তার পর ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুইজন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল—কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালান্তক যমের মত দুই মূর্ত্তি আসিতেছে। একজন বেহারা অপরদিগকে বলিল, "মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়।" অপর আর একজন বলিল, "রাত্রে যখন বেড়াচ্ছে, তখন কি আর ভাল মানুষ?"

তৃতীয় বাহক বলিল, "মানুষ দুটো ভারি জোয়ান।"

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখ্ছি না?

১ম। চক্রবর্ত্তী মশাই কি বলেন? আর তো এগোনো যায় না —ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তাই ত, বড় বিপদ দেখি যে। যা ভেবেছিলেম, তাই হলো।"

এমন সময়ে, যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল, "কোন্ হ্যায় রে?"

বেহারারা অমনি পাল্কী মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, "বাবা গো" শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া দুর্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি তাঁর পাছু-পাছু ছুটিল।

যে দুই জন আসিতেছিল—যাহারা এই দশ জন মনুষ্যের ভয়ের

কারণ—তাহারা পথিক মাত্র। দুই জন হিন্দুস্থানী—দিনাজপুরের রাজসরকারে চাকরীর চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্রিপ্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেহারারা পলাইল দেখিয়া তাহারা একবার খুব হাসিল। তাহার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পাল্কীতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরে চীৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই, চীৎকার শুনিতে পাইলে বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে! প্রথমে ভয়ে প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া পলাইল, তখন প্রফুল্ল বুঝিল—আর একটা কি নূতন বিপদ্। ধীরে ধীরে পাল্কীর কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল, দুই জন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল; যে অল্প ফাঁক রহিল, তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল, মনুষ্য দুই জন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পাল্কী হইতে বাহির হইল—দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি। তার পর, দিন হইলে যা হয় করিব। এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক ওদিক্ বেড়াইতে লাগিল—পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল, এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

যাইতে যাইতে প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল, সকল ঘরের দ্বার খোলা—মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্য-বাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণ পরে প্রফুল্ল কোন বুড়া মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরীমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ—তোমার কোন উপকার করিতে পারি?"

বুড়া বলিল, "অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় নন্দদুলাল! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম, পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও।"

প্রফুল্ল দেখিল বুড়ার ঘরে জল-কলসী আছে, কলসীতে জল আছে; জলপাত্র আছে। কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জল পান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। সুতরাং প্রফুল্ল তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কয়টি কথা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই,—

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল।

বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে। বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না। বুড়ার কবর হয়—এই ইচ্ছা। বুড়ার কথামত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে। হয়ত শাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, "আমি মরিলে, সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিও।"

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তারপর বুড়া বলিতে লাগিল, "আমার কিছু টাকা পোঁতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না—তাহা হইলে, না লইয়া পলাইত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। তাই তোমাকেই সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নীচে একখানা চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুলিবে। একটা সুরঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচের মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সে-ঘরের বায়ুকোণে খুঁজিও—টাকা পাইবে।"

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল। বুড়া বলিল, "এই বাড়ীতে গোহাল আছে—গোহালে গরু আছে—গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও, একটু আপনি খাও।"

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনিবার সময় দেখিয়া আসিল—কবর কাটা—সেখানে কোদালি শাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্নে বুড়ার প্রাণবিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়; সুতরাং লঘু; প্রফুল্লের বল যথেষ্ট। প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া মাটি চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে

স্নান করিয়া ভিজা কাপড় আধখানা পরিয়া রৌদ্রে শুকাইল। তার পরে কোদালি শাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মনে করিল না। প্রফুল্ল দীন দুঃখিনী।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল বুড়াকে মাটি চাপা দিবার পূর্ব্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা মেঝেতে বসান আছে।

এখন শাবল আনিয়া তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে। প্রফুল্ল চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। দেখিল, দিব্যি একটি ঘর। বায়ুকোণ—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তারপর প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে 'ঠুং' করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তাঁর পরিচয় আগে দেই।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে অনেক বয়সে একটা বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। অবশেষে পর্য্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

এক দিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল—মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে—তখনকার পক্ষেও সেকেলে—মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিনচলা ভার হইত। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এই রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ প্রতিদিন ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোর-কুঠরী বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেইসকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক দিন দেখিল, এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কি চক্‌চক করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল—দেখিল, মোহর। ইন্দুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই কোণ খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে কুড়ি ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্ব্বকালে উত্তর-বাঙ্গালায় নীলধ্বজবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবনঃ এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে, কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। পাঠান-সেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তারপর আর তাঁহাকে মনুষ্যলোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কি হইল, কেহ জানে না। তিনি আর কখনও দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি

তাহার ধনরাশি সেইস্থানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে এক দিনের তরেও এ ধনের কথা কিছু জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটিও মোহর লইয়া কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, "এখন কি করিব ? কোথায় যাই ? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে ? যাই বা কোথায় ? বাড়ী ফিরিয়া যাইব ? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে ? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজানি হইবে, চোর ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায় ? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কি ? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ ? এ ধন-রাশির লোভ কে সম্বরণ করিবে ?"

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, অদৃষ্টে যাহাই হোক, দারিদ্র্য-দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাৎ কি ? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও না হয় তাই করিবে।

এইরূপ মন স্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘর দ্বার পরিষ্কার করিল। গোরুর সেবা করিল। শেষ, রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কি? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, দাল, সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায়? প্রফুল্ল ভাবিল, "সন্ধান করিয়া লইব।" জঙ্গলের পথের রেখা আছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "কোথা যাইবে মা?"

প্র। আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ। এ দিকে হাটের পথ কোথা?

প্র। তবে কোন্ দিকে?

ব্রা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

প্র। এই জঙ্গল হইতেই।

ব্রা। এই জঙ্গলে তোমার বাস?

প্র। হাঁ।

ব্রা। তবে তুমি হাটের পথ চেন না?

প্র। আমি নূতন আসিয়াছি।

ব্রা। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আসে না! তুমি কেন আসিলে?

প্র। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রা। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে?

প্র। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মনে

মনে বলিল, "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি?" প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে; যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান হইতে চাল ডাল কিনিতে পার!"

প্রফুল্ল বলিল, "সেই হলে ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত দেখিতেছি।"

ব্রা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা! তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই? দেখিল, সেখানে একখানি কুটীর আছে—তালা চাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালা চাবি খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল—দোকান নয়, তবে হাঁড়ি কলসী, চাল, দাল, নুণ, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল—"তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার লইয়া যাও।"

প্রফুল্ল যাহা পারিল তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "দাম কত দিতে হইবে?"

ব্রা। এক আনা।

প্র। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রা। টাকা আছে? দাও, ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।

প্র। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রা। তবে কি নিয়া হাটে যাইতেছিলে?

প্র। একটি মোহর আছে।

ব্রা। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল। বলিল, "মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।"

প্র। ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রা। সবই মোহর! তা হৌক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন--'সবই মোহর' কথাটা প্রফুল্লের কাণে ভাল লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে, আর সেই লোভেই তাহার বাড়ী দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিষপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল। বলিল "আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড়চোপড়ের বরাৎ আছে।"

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, "মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ী চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব। তা, তুমি কি মনে করিয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে, তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে?

সর্ব্বনাশ! প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না।—আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দ্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।"

প্রফুল্ল স্পন্দহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরে শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভবানী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।"

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া, তাহাতে গোটাকতক ঘা দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জওয়ান লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আজ্ঞা হয়?"

ভবানী বলিল, "এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে

আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মা'র মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।" এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি; একেবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, "চলুন, আপনাকে আমার বাড়ী দেখাইতেছি।"

প্রফুল্ল দ্রব্য সামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া ভবানী ঠাকুরকে বসিতে, প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানি ছেঁড়া কুশাসন ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ভবানী পাঠক বলিল, "এই ভাঙ্গা বাড়ীতে তুমি মোহর পাইয়াছ?"

প্র। আজ্ঞা, হাঁ।

ভ। কত?

প্র। অনেক।

ভ। ঠিক বল কত। ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ী খুঁড়িয়া দেখিবে।

প্র। কুড়ি ঘড়া।

ভ। এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?

প্র। দেশে লইয়া যাইব।

ভ। রাখিতে পারিবে?

প্র। আপনি সাহায্য করিলে পারি।

ভ। এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার। এই বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই। এই বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে, আমি রাখিতে পারিব না।

প্র। তবে আমি এই বনেই এই ধন লইয়া থাকিব। আপনি রক্ষা করিবেন?

ভ। করিব। কিন্তু তুমি এত ধন লইয়া কি করিবে?

প্র। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করে?

ভ। ভোগ করে।

প্র। আমিও ভোগ করিব।

ভবানী ঠাকুর 'হোঃ হোঃ!' করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া ভবানী বলিল, "মা! বোকা মেয়ের মত কথাটা বলিলে, তাই হাসিলাম। তোমার ত কেহই নাই বলিয়াছ, তুমি কাকে নিয়া এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে? একা কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়?"

প্রফুল্ল অধোবদন হইল। ভবানী বলিতে লাগিল, "শোন, লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্য সঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার যো নাই। কেন না তোমার কেহ নাই। তুমি পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার, না হয় নরকের পথ সাফ করিতে পার। কোন্‌টা করিবে?"

প্রফুল্ল বড় সাহসী। বলিল, "এ সকল কথা ত ডাকাইতের সর্দ্দারের মত নহে।

ভ। না; তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতের সর্দ্দার নহি। তোমাকে আমি মা বলিয়াছি, সুতরাং আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে ভাল যা, তাই বলিব। ধনের ভোগ তোমার হইতে পারে না—কেন না, তোমার কেহ নাই। তবে এই ধনের দ্বারা বিস্তর পাপ অথবা বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার।—কোন্ পথে যাইতে চাও?

প্র। বাবা! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব? আমি বড় কাঙ্গাল—আমার অন্ন বস্ত্র

জুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না—দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও। আমি নিষ্পাপে যাতে একমুঠো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।

ভবানী মনে মনে প্রফুল্লকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। প্রকাশ্যে বলিল, "ধন তোমার, আমি লইব না।"

প্রফুল্ল বিস্মিত হইল। মনের ভাব বুঝিয়া ভবানী বলিল, "তুমি ভাবিতেছ, ডাকাইতি করে, পরের ধন কাড়িয়া খায়, আবার এ রকম ভাণ করে কেন? সে কথা তোমায় এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও, তোমার এ ধন লুঠ করিয়া লইলেও লইতে পারি। এখন এ ধন লইব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?"

প্র। আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কি করিব।

ভ। শিখাইতে পাঁচ সাত বছর লাগিবে। যদি শেখ, আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ সাত বৎসর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না। তোমার ভরণ পোষণের কোন কষ্ট হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে। কেমন, স্বীকৃত আছ?

প্র। বাস করিব কোথায়?

ভ। এইখানে। ভাঙা চোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব।

প্র। এইখানে একা বাস করিব?

ভ। না, আমি দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব, তাহারা তোমার কাছে থাকিবে। কোন ভয় করিও না। এ বনে আমি কর্ত্তা। আমি থাকিতে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

প্র। আপনি কিরূপে শিখাইবেন?

ভ। তুমি লিখিতে পড়িতে জান?

প্র। না।

ভ। তবে প্রথমে লেখাপড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। এ অরণ্যমধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল।

ভবানী ঠাকুর বিদায় লইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে। ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রঙ্গরাজ ? এখানে কেন ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার সন্ধানে। আপনি এখানে কেন ?"

ভবানী। যা এতদিন সন্ধান করিতেছিলাম, তা পাইয়াছি।

রঙ্গ। রাজা ?

ভ। রাণী।

রঙ্গ। রাজা রাণী আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে।

ভ। আমি সেরকম রাজা খুঁজি না। আমি খুঁজি যা, তা ত তুমি জান।

রঙ্গ। এখন পাইয়াছেন কি ?

ভ। সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। দেখিও, এই বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কোন পুরুষ মানুষ না প্রবেশ করিতে পায়।

রঙ্গ। যে আজ্ঞা। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুটিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

ভ। চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী ঠাকুর অঙ্গীকারমত দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। একজন ঘাটে হাটে যাইবে, আর একজন প্রফুল্লের কাছে অনুক্ষণ থাকিবে। যে ঘাটে হাটে যাইবে, তাহার নাম গোবরার মা, বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কাণে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না ; কোন মতে ইসারা ইঙ্গিতে চলিত ; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না। এ রকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে।

যে কাছে থাকিবার জন্য আসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন-প্রকৃতির স্ত্রীলোক। বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বামুনের মেয়ে, নাম—নিশি। ভবানী ঠাকুরই এই নাম রাখিয়াছেন।

এই নিশি ঠাকুরাণীর কাছেই প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। বর্ণ শিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাহার কাছে শিখিল। তারপর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন। আরম্ভ করাইয়া দুই চার দিন পড়াইয়া অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিতা হইল। ক্রমে ক্রমে প্রফুল্ল সংস্কৃত সাহিত্য ও বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিল।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্নপ্রকার শিক্ষাও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। লোক থাকিতে প্রফুল্লকে কষ্টসহিষ্ণু করিয়া তোলা, প্রচুর ধন থাকিতে আহারে সংযত—শয়ন, বসন, নিদ্রা সম্বন্ধেও এতদনুরূপ অভ্যাস চলিতে থাকিল। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত।

প্রফুল্ল জল, বাতাস, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু

করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর বলিলেন, “বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে। এই মল্লযুদ্ধ নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না। তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল।”

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বছরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

একাদশীর দিন মাছ ছাড়া আর একটি বিষয়ে প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। আপনার পরিচয় কিছু দিল না। ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া, ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন, “পাঁচ বৎসর হইল, তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন তোমার হস্তগত ধন, তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিও। আহার আমি আর যোগাইব না,—তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই, কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছি,—আর একবার বলি। এখন তুমি কোন পথ অবলম্বন করিবে?”

প্রফুল্ল বলিল, “কর্ম্ম করিব, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে।”

ভবানী বলিল, “ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু যাহাই কর, সর্ব্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। এখন বল দেখি মা, তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে?”

প্রফুল্ল ধীরে ধীরে পাল্কীর কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল
দুইজন মনুষ্য আসিতেছে......
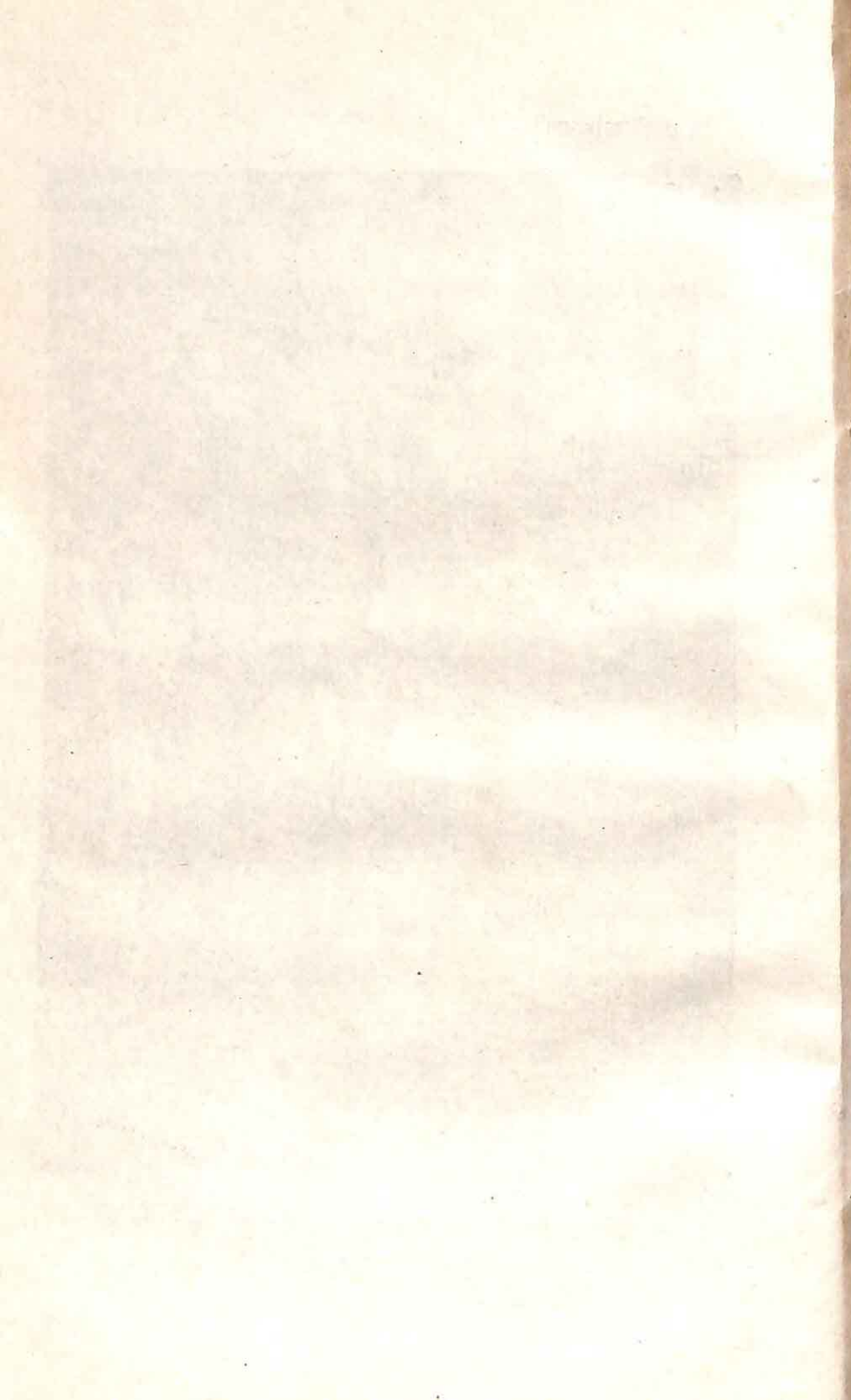
প্র। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম। আপনি এ ধন লইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।

ভ। ধনে আমারও কোন প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

প্র। তবে কি ?

ভ। আমি রাজত্ব করি।

প্র। ডাকাইতি কি রকম রাজত্ব ?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভ। এ দেশে রাজা নাই। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া ?

ভ। শুন, বুঝাইয়া দিতেছি।

ভবানী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্ব্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে।

এই সকল বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তাহা তুমি দুইদিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে ?"

প্রফুল্লের হৃদয় প্রজাবর্গের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিল সে ভবানী ঠাকুরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিল। বলিল, "আমি সঙ্গে যাইব। ধনব্যয়ে যদি আমার এখন অধিকার

হইয়াছে, তবে আমি কিছু ধন সঙ্গে লইয়া যাইব। দুঃখীদিগকে দিয়া আসিব।”

ভবানী ঠাকুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি যখন ডাকাইতিতে সদলে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের ঘড়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। নিশিও সঙ্গে গেল।

ভবানী ঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হৌক তাঁহার একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রফুল্লকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া শাণ দিয়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মত নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ এত ধন কোন পুরুষের নাই। ধনের ধার বড় ধার। তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল—প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত।

———

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে দিন প্রফুল্লকে বাগ্দীর মেয়ে বলিয়া হরবল্লভ তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হইতে দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর হরবল্লভ রায়ের পক্ষে বড় ভাল গেল না। দেশের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল, ডাকাইতে তাহা লুঠিয়া লইল। সেবার দেবী সিংহের খাজনা দেওয়া হইল না। দেবী সিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবী সিংহের বেচিয়া লওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেষ্টিংস্ সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্ম্মচারী দেবী সিংহের আজ্ঞাবহ ; বেচা কেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশ হাজার টাকার মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবী সিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকি খাজনা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। দেবী সিংহের পীড়াপীড়িতে, কয়েদের আশঙ্কায়, হরবল্লভ আর একটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সকল কারণে আয় বড় কমিয়া আসিল। কিন্তু ব্যয় কিছুই কমিল না—বুনিয়াদী চাল খাটো করা যায় না। সকল লোকেরই প্রায় এমন না এমন একদিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, 'হয় সাবেক চাল ছাড়, নয় আমায় ছাড়!' অনেকেই উত্তর দেন, 'মা! তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।' হরবল্লভ তাহারই একজন। দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়া-কর্ম্ম, দান-ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্ব্বমতই হইতে লাগিল—বরং ডাকাইতে চালান লুঠিয়া লওয়া অবধি লাঠিয়ালের খরচটা কিছু বাড়িয়াছিল। খরচ আর কুলায় না। কিস্তী কিস্তী সরকারী খাজনা বাকি পড়িতে লাগিল। বিষয় আশয় যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া

যায়, আর থাকে না। দেনার উপর দেনা হইল, সুদে আসল ছাপাইয়া উঠিল—টাকা আর ধার পাওয়া যায় না।

এদিকে দেবী সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না—শেষে হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় ধুম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। কোন্ শ্বশুরবাড়ী, তাহা বলা বাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ী।

কিন্তু যার জন্য এত, তার মনে সুখ নাই। ব্রজেশ্বর আমোদ আহ্লাদের জন্য শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। শ্বশুরের টাকা আছে—শ্বশুর ধার দিলে দিতে পারে, তাই ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে আসিয়াছে।

শ্বশুর বলিলেন, "বাপু হে, আমার যে টাকা, সে তোমারই জন্য আছে—আমার আর কে আছে, বল ? কিন্তু টাকাগুলি যতদিন আমার হাতে আছে, ততদিন আছে,—তোমার বাপকে দিলে কি আর থাকবে। মহাজনে খাইবে। অতএব, কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করিতে চাও ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "হোক,—আমি ধনের প্রত্যাশী নই—আমার বাপকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ।"

শ্বশুর রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি ? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।"

কড়া কথায় ব্রজেশ্বরের বড় রাগ হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "তবে

আপনার মেয়ে টাকা লইয়া থাকুক। বুঝিয়াছি, জামাইয়ে আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম।”

তখন সাগরের পিতা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ব্রজেশ্বর কড়া কড়া উত্তর দিল। কাজেই ব্রজেশ্বর তল্পিতল্পা বাঁধিতে লাগিল। শুনিয়া, সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন। জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তার পর সাগরের পালা।

সাগর ব্রজেশ্বরের পায় পড়িল, বলিল, “আর এক দিন থাক—আমি ত কোন অপরাধ করি নাই।”

ব্রজেশ্বরের তখন বড় রাগ ছিল—রাগে পা টানিয়া লইলেন। পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিল। সাগর মনে করিল, স্বামী রাগ করিয়া আমাকে লাথি মারিলেন। সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, “কি? আমায় লাথি মারিলে?”

বাস্তবিক ব্রজেশ্বরের লাথি মারিবার ইচ্ছা ছিল না,—তাই বলিলেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু একে রাগের সময়, আবার সাগর চোখ মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল,—ব্রজেশ্বরের রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন, “যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড় মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড়মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজা করিয়াছিলেন।”

সাগর রাগে জ্ঞান হারাইল। বলিল, “ঝকমারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।”

ব্র। পালটে লাথি মারিবে নাকি?

সা। আমি এত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

সাগরের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পিছনের জানালা হইতে কে বলিল, “আমার পা টিপিয়া দিবে।”

সাগরের মুখে সেই রকম কি কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল, "আমার পা টিপিয়া দিবে।"

ব্রজেশ্বরও রাগে সপ্তমে চড়িয়া কোন দিকে না চাহিয়া বলিল, "আমারও সেই কথা। যতদিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, ততদিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।"

তখন রাগে রাগে তিনটা হইয়া ফুলিয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল। সাগর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল।

এমন সময়ে সেই ঘরে একজন পরিচারিকা আসিল, সাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই জানেলা হইতে কথা কহিয়াছিলি?"

সে বলিল, "কই না?"

সাগর বলিল, "তবে কে জানেলায় দেখ্ ত।"

তখন সাক্ষাৎ ভগবতীর মত রূপবতী ও তেজস্বিনী এক জন স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে বলিল, "জানালায় আমি ছিলাম।"

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

তখন সে স্ত্রীলোক বলিল, "তোমরা কি কেউ আমায় চেন না?"

সাগর বলিল, "না—কে তুমি?" তখন সেই স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "আমি দেবী চৌধুরাণী।"

পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। সেও কাঁপিতে কাঁপিতে—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল।

দেবী চৌধুরাণী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চুপ রহো। খাড়া রহো!"

পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাগরেরও গায়ে ঘাম দিতেছিল। সাগরের মুখেও কথা

ফুটিল না। যে নাম তাহাদের কানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলে-বুড়ো কে না শুনিয়াছিল? সে নাম অতি ভয়ানক।

কিন্তু সাগর আবার ক্ষণেক পরে হাসিয়া উঠিল। তখন দেবী চৌধুরাণীও হাসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে একটা বড় তেঁতুল-গাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে।

বজরার নাবিকেরা এক পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—এক জন মানুষ।

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচার উপর একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক বীণাবাদনে নিযুক্তা। বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল।

তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক জন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইল। এ ব্যক্তি পুরুষ। সে দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠগঠন, গলায় যজ্ঞোপবীত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

গালিচার উপর একটা ছোট দূরবীণ পড়িয়াছিল। সুন্দরী দূরবীণ লইয়া ঐ ব্যক্তির হাতে দিল—কিছু বলিল না। সে দূরবীণ চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিল।

যুবতী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "রঙ্গরাজ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "আজ্ঞা!"

"দেখ কি ?"

"কয়জন লোক আছে, তাই দেখি।"

"কয়জন ?"

"ঠিক ঠাওর পাই না। বেশী নয়। খুলিব ?"

"খোল—ছিপ। অঁাধারে অঁাধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও।"

তখন রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, "ছিপ খোল।"

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, তেঁতুলগাছের ছায়ায় আর একখানি নৌকা অন্ধকারে লুকাইয়াছিল। সেখানি ছিপ—ষাট হাত লম্বা, তিন হাতের বেশী চৌড়া নয়। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। রঙ্গরাজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সেই পঞ্চাশ জন একেবারে উঠিয়া বসিল। নিঃশব্দে ছিপ খুলিয়া, তাহারা বজরায় আসিয়া লাগাইল। রঙ্গরাজ তখন নিজে পঞ্চ হাতিয়ার বাঁধিয়া উহার উপর উঠিল। সেই সময়ে যুবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "রঙ্গরাজ, আগে যাহা বলিয়া দিয়াছি, মনে থাকে যেন।"

"মনে আছে" বলিয়া রঙ্গরাজ ছিপে উঠিল। ছিপ নিঃশব্দে তীরে তীরে উজাইয়া চলিল। এদিকে যে বজরা রঙ্গরাজ দূরবীণে দেখিয়াছিল, তাহা নদী বাহিয়া খরস্রোতে তীব্রবেগে আসিতেছিল। ছিপকে বড় বেশী উজাইতে হইল না। বজরা নিকট হইলে, ছিপ তীর ছাড়িয়া বজরার দিকে ধাবমান হইল। পঞ্চাশখানা বোটে, কিন্তু শব্দ নাই।

এখন, সেই বজরার ছাদের উপরে আটজন হিন্দুস্থানী রক্ষক ছিল। এত লোক সঙ্গে না করিয়া তখনকার দিনে কেহ রাত্রিকালে নৌকা খুলিতে সাহস করিত না। আট জনের মধ্যে, দুই জন হাতিয়ারবন্ধ

হইয়া, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল—আর ছয় জন মধুর দক্ষিণ বাতাসে চাঁদের আলোতে কালো দাড়ি ছড়াইয়া সুনিদ্রায় অভিভূত ছিল। যাহারা পাহারায় ছিল, তাদের মধ্যে এক জন দেখিল—ছিপ বজরার দিকে আসিতেছে। সে দস্তুরমত হাঁকিল, "ছিপ তফাৎ।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "তোর দরকার হয়, তুই তফাৎ যা।"

প্রহরী দেখিল, বেগোছ! ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। রঙ্গরাজ বুঝিল, ফাঁকা আওয়াজ। হাসিয়া বলিল, "কি পাঁড়ে ঠাকুর! একটা ছররাও নাই? ধার দিব?"

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তারপর বন্দুক নামাইয়া বলিল, "তোমায় এবার মারিব না। এবার তোমার লাল পাগড়ি উড়াইব।" এই কথা বলিতে বলিতে রঙ্গরাজ বন্দুক রাখিয়া, তীর ধনুক লইয়া সজোরে তীর ত্যাগ করিল। প্রহরীর মাথার লাল পাগড়ি উড়িয়া গেল। প্রহরী 'রাম রাম!' শব্দ করিতে লাগিল।

বলিতে বলিতে ছিপ আসিয়া বজরার পিছনে লাগিল। অমনি দশ বার জন লোক ছিপ হইতে হাতিয়ার সমেত বজরার উপর উঠিয়া পড়িল। যে ছয় জন হিন্দুস্থানী নিদ্রিত ছিল, তাহারা বন্দুকের আওয়াজে জাগরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাতিয়ার হাতড়াইতে তাহাদের দিন গেল। ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে নিমেষমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল।

যে দুই জন আগে হইতে জাগ্রত ছিল, তাহারা লড়াই করিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অধিক, শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন ছিপের লোক বজরার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বজরার দ্বার বন্ধ।

ভিতরে ব্রজেশ্বর। তিনি শ্বশুরবাড়ী হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে এই বিপদ। এ কেবল তাঁহার সাহসের ফল। অন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রে বজরা খুলিত না।

রঙ্গরাজ কপাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! দ্বার খুলুন।"

ভিতর হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত ব্রজেশ্বর উত্তর করিল, "কে? এত গোল কিসের?"

রঙ্গরাজ বলিল, "গোল কিছুই না—বজরায় ডাকাইত পড়িয়াছে।"

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া, পরে ডাকিতে লাগিল, "পাঁড়ে! তেওয়ারী! রামসিং!"

রামসিং ছাদের উপর হইতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! শালালোক সব কোইকো বাঁধকে রাকৃখা।"

ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মত বীরপুরুষদের ডালরুটি খাইতে না দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! ডাকাইতের এত বড় ভ্রম। ভাবনা করিও না—কাল ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।"

শুনিয়া রঙ্গরাজও ঈষৎ হাসিল। বলিল, "আমারও সেই মত; এখন দ্বার খুলিবেন বোধ হয়!"

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

রঙ্গরাজ। আমি একজন ডাকাইত মাত্র। দ্বার খোলেন এই ভিক্ষা।

"কেন দ্বার খুলিব?"

রঙ্গরাজ। আপনার সর্ব্বস্ব লুটপাট করিব।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কেন? আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ীওয়ালা পাইলে? আমার হাতে দোনলা বন্দুক আছে—তৈয়ার, যে প্রথম কামরায় প্রবেশ করিবে, নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ লইব।"

রঙ্গরাজ। এক জন প্রবেশ করিব না, কয় জনকে মারিবেন? আপনি ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ! এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে, মিছামিছি ব্রহ্মহত্যায় কাজ কি?

ব্রজেশ্বর বলিল, "সে পাপটা না হয় আমিই স্বীকার করিব।"

এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড়্ মড়্ শব্দ হইল। বজরার

পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া, একজন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ব্রজেশ্বর হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। দস্যু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুই বার পদাঘাত করিল। কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গরাজ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রজেশ্বর আবার বন্দুক ফিরাইয়া ধরিয়া, রঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিতেছিল, এমন সময় রঙ্গরাজ তাহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। দুই জনেই তুল্য বলশালী, তবে রঙ্গরাজ অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত।

ব্রজেশ্বর বলিল, "যাহা বজরায় আছে—সব লইয়া যাও, এখন আর আপত্তি করিব না।"

জিনিষপত্র বজরায় বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি, পূজার সামগ্রী, এইরূপ মাত্র। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা সেই সকল দ্রব্য ছিপে তুলিয়া ফেলিল। তখন আরোহী রঙ্গরাজকে বলিল, সব জিনিষ লইয়াছ, আর কেন দিক্ কর, এখন স্বস্থানে যাও।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "যাইতেছি! কিন্তু আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ব্রজ। সে কি? আমি কোথায় যাইব?

রঙ্গ। আমাদের রাণীর কাছে।

ব্রজ। তোমাদের আবার রাণী কে?

রঙ্গ। আমাদের রাজরাণী।

ব্রজ। তিনি আবার কে? ডাকাইতের রাজরাণী ত কখনও শুনি নাই।

রঙ্গ। দেবী রাণীর নাম কখনও শুনেন নাই?

ব্রজ। ও হো! তোমরা দেবী চৌধুরাণীর দল?

রঙ্গ। দলাদলি আবার কি? আমরা রাণীজীর কার্‌পর্‌দাজ।

ব্রজ। যেমন রাণী, তেমনি কার্‌পর্‌দাজ। তা, আমাকে রাণী-দর্শনে যাইতে হইবে কেন? আমাকে কয়েদ রাখিয়া কিছু আদায় করিবে, এই অভিপ্রায়?

রঙ্গ। কাজেই। বজরায় ত কিছু পাইলাম না। আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়।

ব্রজ। আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে—তোমাদের রাজরাণী একটা দেখিবার জিনিষ শুনিয়াছি। তিনি না কি যুবতী ?

রঙ্গ। তিনি আমাদের মা। সন্তানে মার বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্রজ। শুনিয়াছি, বড় রূপবতী।

রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।

ব্রজ। চল, তবে ভগবতী-দর্শনে যাই।

এই বলিয়া, ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে, বজরার মাঝিমাল্লা সকলে ভয়ে জলে পড়িয়া কাছি ধরিয়া ভাসিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তোমরা বজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও। তোমাদের জান, মান, দৌলত ও ইজ্জত সব বজায় আছে! তোমরা বড় হুঁসিয়ার!"

মাঝিরা তখন একে একে বজরায় উঠিতে লাগিল। ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাদের দ্বারবান্‌দের বাঁধন খুলিয়া দিতে পারি কি ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপত্তি নাই। উহারা যদি হাত খোলা পাইয়া, আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখনই আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। ইহা উহাদের বুঝাইয়া দিন।"

ব্রজেশ্বর দ্বারবান্‌দিগকে সেইরূপ বুঝাইয়া দিলেন, আর আদেশ করিলেন যে, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এইখানে বজরা লইয়া থাক। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রঙ্গরাজের সঙ্গে ছিপে উঠিলেন।

ছিপের নাবিকেরা "দেবী রাণীজী-কি জয়" হাঁকিল—ছিপ বাহিয়া চলিল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর যাইতে যাইতে রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কতদূর লইয়া যাইবে—তোমার রাণীজী কোথায় থাকেন ?"

রঙ্গ। ঐ বজরা দেখিতেছেন না ? ঐ বজরা তাঁর।

ব্রজ। ও বজরা ? আমি মনে করিয়াছিলাম, ওখানা ইংরেজের জাহাজ—রঙ্গপুর লুটিতে আসিয়াছে। তা অত বড় বজরা কেন ?

রঙ্গ। রাণীকে রাণীর মত থাকিতে হয়। উহাতে সাতটা কামরা আছে।

ব্রজ। এত কামরায় কে থাকে ?

রঙ্গ। একটায় দরবার। একটায় রাণীর শয়নঘর। একটায় চাক্‌রাণীরা থাকে। একটায় স্নান হয়। একটায় পাক হয়। একটা ফটক। বোধ হয়, আপনাকে আজ সেই কামরায় থাকিতে হইবে।

এই কথোপকথন হইতে হইতে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে ভিড়িল। রঙ্গরাজ ছিপ হইতে কামরার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া "রাণীজী-কি-জয়" বলিল। দ্বারে রেশমী পর্দা ফেলা আছে—ভিতর দেখা যায় না। ভিতর হইতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ ?"

রঙ্গ। সব মঙ্গল।

দেবী। তোমাদের কেহ জখম হইয়াছে ?

রঙ্গ। কেহ না।

দেবী। তাহাদের কেহ খুন হইয়াছে ?

রঙ্গ। কেহ না। আপনার আজ্ঞামত কাজ হইয়াছে।

দেবী। তাহাদের কেহ জখম হইয়াছে ?

রঙ্গ। দুইটা হিন্দুস্থানী দুই একটা আঁচড় খেয়েছে। কাঁটা ফোটার মত।

দেবী। মাল ?

রঙ্গ। সব আনিয়াছি। মাল এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু?

রঙ্গ। বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছি।

দেবী। হাজির কর।

রঙ্গরাজ তখন ব্রজেশ্বরকে ইঙ্গিত করিল, ব্রজেশ্বর ছিপ হইতে উঠিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" দেবীর যেমন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় সাফ নয়।

ব্রজেশ্বর ভয় কাহাকে বলে, তাহা বাল্যকাল হইতে জানেন না। যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর-বাঙ্গলা কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিল, "মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ ত কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের বাঁদী।" হাসিয়া ব্রজেশ্বর দেবীর কথার উত্তর দিল, "পরিচয় লইয়া কি হইবে? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—নামে ত টাকা হইবে না।"

দেবী। হইবে বৈ কি? আপনি কি দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে।

ব্রজ। সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন?

দেবী। নহিলে আপনাকে আমরা আনিতাম না।

ব্রজ। আমি যদি বলি, আমার নাম দুঃখিরাম চক্রবর্ত্তী, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?

দেবী। না।

ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

দেবী। আপনি বলেন কিনা, দেখিবার জন্য।

ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না।

ব্রজ। দয়ারাম বক্সী।

দেবী। তাও না।

ব্রজ। ব্রজেশ্বর রায়।

দেবী। হইতে পারে।

এই সময়ে দেবীর কাছে আর একজন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বসিল। বলিল, "গলাটা ধ'রে গেছে যে!"

দেবীর চক্ষের জল আর থামিল না। স্ত্রীলোকটির কানে কানে বলিল, "আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না, তুই কথা ক'। সব জানিস ত?"

এই বলিয়া দেবী সে কামরা হইতে উঠিয়া অন্য কামরায় গেল। ঐ স্ত্রীলোকটি দেবীর আসন গ্রহণ করিয়া ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে—ইনি সেই নিশি ঠাকুরাণী।

নিশি বলিল, "এইবার ঠিক্ বলেছ,—তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ব্রজেশ্বরের একটু গোল বাঁধিল। পর্দ্দার আড়ালে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—কিন্তু কথার আওয়াজে সন্দেহ হইল যে, যে কথা কহিতেছিল, এ সে বুঝি নয়। তার আওয়াজটা বড় মিঠে লাগিতেছিল —এ বুঝি তত মিঠে নয়। যাই হউক, কথার উত্তরে ব্রজেশ্বর বলিলেন, "যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকাইয়া লউন— আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। কি দরে আমাকে ছাড়িবেন?"

নিশি। এক কড়া কাণা কড়ি। সঙ্গে আছে কি? থাকে যদি, দিয়া চলিয়া যান।

ব্রজ। আপাততঃ সঙ্গে নাই।

নিশি। বজরা হইতে আনিয়া দিন।

ব্রজ। বজরাতে যাহা ছিল, তাহা আপনার অনুচরেরা লইয়া আসিয়াছে। আর এক কড়া কাণা কড়িও নাই।

নিশি। মাঝিদের কাছে ধার করিয়া আনুন।

ব্রজ। মাঝিরাও কাণা কড়ি রাখে না।

নিশি। তবে যতদিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনাইয়া দিতে পারেন, ততদিন কয়েদ থাকুন।

ব্রজেশ্বর তারপর শুনিলেন কামরার ভিতরে আর একজন কে—

কণ্ঠে সেও বোধ হয় স্ত্রীলোক—দেবীকে বলিতেছে, "রাণীজি! যদি এক কড়া কাণা কড়িই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কাণা কড়ি দিতেছি, আমার কাছে উহাকে বিক্রী করুন।"

ব্রজেশ্বর শুনিলেন, রাণী উত্তর করিল, "ক্ষতি কি? কিন্তু মানুষটা নিয়ে তুমি কি করিবে? ব্রাহ্মণ, জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে পারিবে না।"

ব্রজেশ্বর প্রত্যুত্তরও শুনিলেন—রমণী বলিল, "আমার রাঁধিবার ব্রাহ্মণ নাই—আমাকে রাঁধিয়া দিবে।"

তখন নিশি ব্রজেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনিলেন—আপনি বিক্রী হইলেন—আমি কাণা কড়ি পাইয়াছি। যে আপনাকে কিনিল, আপনি তাহার সঙ্গে যান, রাঁধিতে হইবে।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "কই তিনি?"

নিশি। স্ত্রীলোক—বাহিরে যাইবে না, আপনি ভিতরে আসুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর অনুমতি পাইয়া, পর্দ্দা তুলিয়া, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইলেন। কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারু-চিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্ত জনে দশভূজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ—মখমলের কামদার বিছানা, তিন দিকে সেইরূপ বালিশ। সোনার আতরদান, তারই গোলাব-পাশ, সোনার বাটা, সোনার পুষ্পপাত্র—তাহাতে রাশীকৃত সুগন্ধি ফুল; সোনার আলবোলা; পোরজরের সট্‌কা—সোনার মুখনলে মতির থোপ দুলিতেছে—

......খুঁড়িতে খুঁড়িতে 'ঠং' করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে।
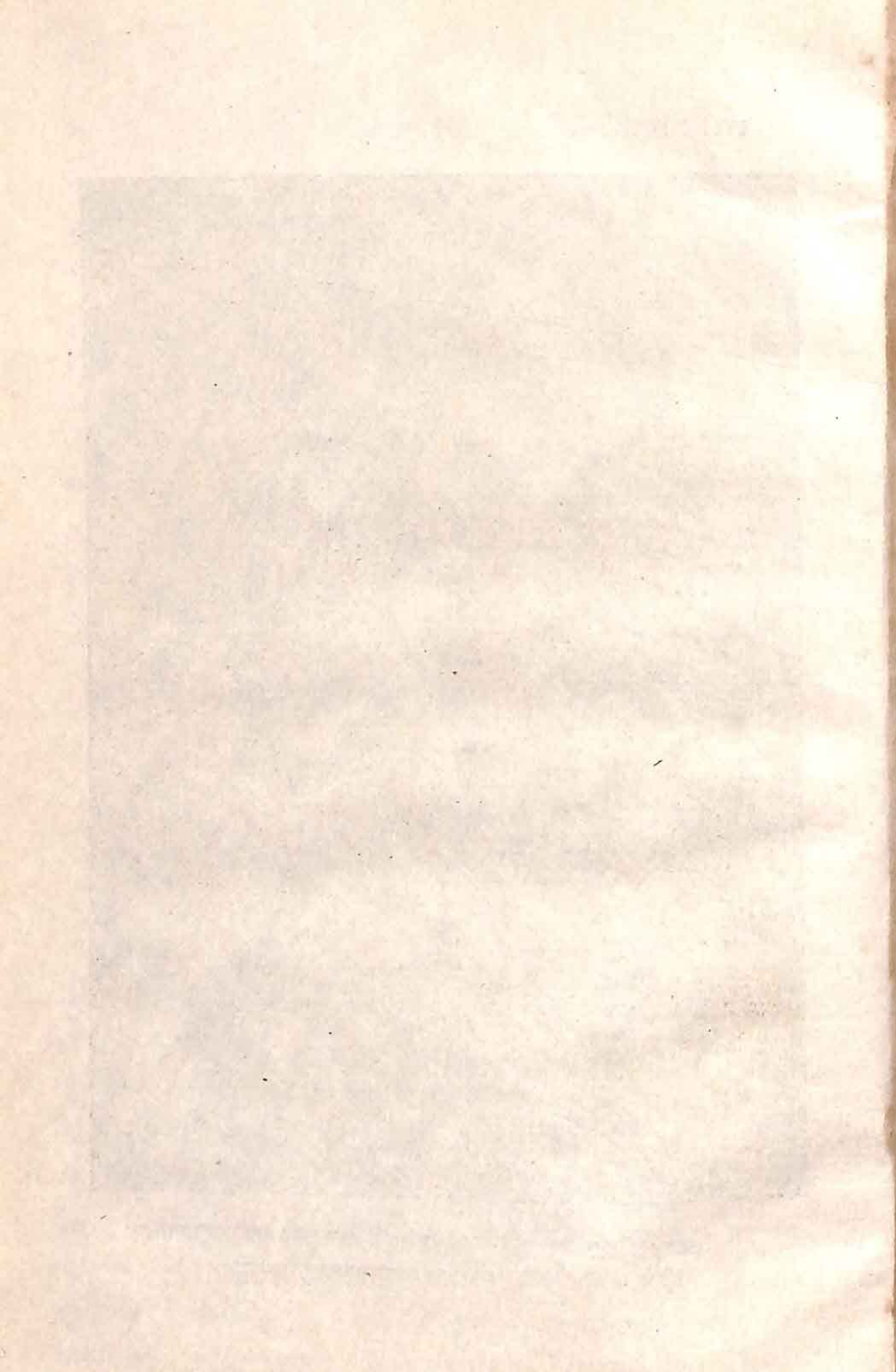
তাহাতে মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দুই পাশে দুই রূপার ঝাড়, তাহাতে বহুসংখ্যক সুগন্ধি দীপ রূপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে ; উপরের ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ সোনার শিকলে লট্‌কান আছে। চারি কোণে চারিটি রূপার পুতুল, চারিটি বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে।—মসনদের উপর একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাহার মুখের উপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে। মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না—কিন্তু তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ—আর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ অনুভূত হইতেছে ; কানের গহনা কাপড়ের ভিতর হইতে জ্বলিতেছে—তার অপেক্ষা বিস্তৃত চক্ষের তীব্র কটাক্ষ আরও ঝলসিতেছে—স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।

ব্রজেশ্বর দরবার-কামরায় প্রবেশ করিয়া, শয়ানা সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীজীকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব ?"

সুন্দরী উত্তর করিল, "আমি রাণীজী নই।"

ব্রজশ্বের দেখিলেন, এতক্ষণ ব্রজেশ্বর যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, এ তাহার গলার আওয়াজ নহে। অথচ তার আওয়াজ হইতে পারে ; কেন না, বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এ স্ত্রীলোক কণ্ঠ বিকৃত করিয়া কথা কহিতেছে। মনে করিলেন, বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা, মায়াবিনী—এত কুহক না জানিলে মেয়েমানুষ হইয়া ডাকাইতি করে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম—তিনি কোথায় ?"

সুন্দরী বলিল, "তোমাকে আসিতে অনুমতি দিয়া, তিনি শুইতে গিয়াছেন। রাণীতে তোমার কি প্রয়োজন ?"

ব্রজ। তুমি কে ?

সুন্দরী। তোমার মুনিব।

ব্রজ। আমার মুনিব ?

সুন্দরী। জান না, এইমাত্র তোমাকে এক কড়া কাণা কড়ি দিয়া কিনিয়াছি ?

ব্রজ। সত্য বটে। তা তোমাকেই কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?

সুন্দরী। আশীর্ব্বাদের রকম আছে না কি?

ব্রজ। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে এক রকম আশীর্ব্বাদ করিতে হয়,—বিধবাকে অন্যরূপ। পুত্রবতীকে—

সুন্দরী। আমাকে "শীগগির মর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রজ। সে আশীর্ব্বাদ আমি কাহাকেও করি না—তোমার এক-শ তিন বছর পরমায়ু হৌক।

সুন্দরী। আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ভাত রাঁধিবে?

ব্রজ। আগে এক দিন ত রাঁধি। খেতে পার ত, না হয় আটাত্তর বৎসর রাঁধিব।

সুন্দরী। তবে বসো—কেমন রাঁধিতে জান, পরিচয় দাও।

ব্রজেশ্বর তখন সেই কোমল গালিচার উপর বসিলেন।

সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

ব্রজ। তা ত তোমরা সকলেই জান, দেখিতেছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর। তোমার নাম কি? গলা অত মোটা করিয়া কথা কহিতেছ কেন? তুমি কি চেনা মানুষ?

সুন্দরী। আমি তোমার মুনিব—আমাকে 'আপনি', 'মশাই' আর 'আজ্ঞে' বলিবে।

ব্রজ। আজ্ঞে, তাই হইবে। আপনার নাম?

সুন্দরী। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধরিতে পারিবে না। বরং বল ত আমিও তোমার নাম ধরিব না।

ব্রজ। তবে কি বলিয়া ডাকিলে আমি 'আজ্ঞা' বলিব?

পাঁচকড়ি। আমি 'রামধন' বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি আমাকে 'মুনিব ঠাকরুণ' বলিও। এখন তোমার পরিচয় দাও—বাড়ী কোথায়?

ব্রজ। এক কড়ায় কিনিয়াছেন—অত পরিচয়ের প্রয়োজন কি?

পাঁচ। ভাল, সে কথা নাই বলিলে। রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। রাঢ়ী, না বারেন্দ্র, না বৈদিক?

ব্রজ। হাতের ভাত ত খাইবেন—যাই হই না।

পাঁচ। তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও—তাহা হইলে তোমাকে অন্য কাজ দিব।

ব্রজ। অন্য কি কাজ?

পাঁচ। জল তুলিবে, কাঠ কাটিবে—কাজের অভাব কি!

ব্রজ। আমি রাঢ়ী।

পাঁচ। তবে তোমায় জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে হইবে—আমি বারেন্দ্র। তুমি রাঢ়ী—কুলীন, না বংশজ?

ব্রজ। এ কথা ত বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ জুটিবে কি? আমি কৃতদার।

পাঁচ। কৃতদার? কয় সংসার করিয়াছেন?

ব্রজ। জল তুলিতে হয়—জল তুলিব—অত পরিচয় দিব না।

তখন পাঁচকড়ি দেবী রাণীকে ডাকিয়া বলিল, "রাণীজী! বামুন ঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।"

নিশি অপর কক্ষ হইতে উত্তর করিল, "বেত লাগাও।"

তখন দেবীর একজন পরিচারিকা শপাৎ করিয়া একগাছা লিক্‌লিকে সরু বেত পাঁচকড়ির বিছানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি বেত পাইয়া ঢাকাই রুমালের ভিতর মধুর অধর চারু দন্তে টিপিয়া বিছানায় বার দুই বেতগাছা আছড়াইল। ব্রজেশ্বরকে বলিল, "দেখিয়াছ?"

ব্রজেশ্বর হাসিলেন। বলিলেন, "আপনারা সব পারেন। কি বলিতে হইবে, বলিতেছি।"

পাঁচ। তোমার পরিচয় চাই না—পরিচয় লইয়া কি হইবে? তোমার রান্না ত খাইব না। তুমি আর কি কাজ করিতে পার, বল?

ব্রজ। হুকুম করুন।

পাঁচ। জল তুলিতে জান?

ব্রজ। না।

পাঁচ। কাঠ কাটিতে জান ?

ব্রজ। না।

পাঁচ। বাজার করিতে জান ?

ব্রজ। মোটামুটি রকম।

পাঁচ। মোটামুটিতে চলিবে না। বাতাস করিতে জান ?

ব্রজ। পারি।

পাঁচ। আচ্ছা, এই চামর নাও, বাতাস কর।

ব্রজেশ্বর চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। পাঁচকড়ি বলিল, "আচ্ছা, একটা কাজ জান ? পা টিপিতে জান ?"

ব্রজেশ্বরের তুরদৃষ্ট, তিনি পাঁচকড়িকে মুখরা দেখিয়া, একটি ছোট রকমের রসিকতা করিতে গেলেন। এই দস্যু নেত্রীদিগের কোন রকমে খুশি করিয়া মুক্তি লাভ করেন, সে অভিপ্রায়ও ছিল। অতএব পাঁচ-কড়ির কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপিব, সে ত ভাগ্য—"

"তবে একবার টেপ না" বলিয়া অমনি পাঁচকড়ি আল্‌তাপরা রাঙা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর নাচার—আপনি পা টেপার নিমন্ত্রণ লইয়াছেন, কি করেন। ব্রজেশ্বর কাজেই তুই হাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিলেন, "এ কাজটা ভাল হইতেছে না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি।"

তখন তুষ্টা পাঁচকড়ি ডাকিল, "রাণীজি! একবার এদিকে আসুন।"

দেবী আসিতেছে, ব্রজেশ্বর পায়ের শব্দ পাইলেন। পা নামাইয়া দিলেন। পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, "সে কি ? পিছাও কেন ?"

পাঁচকড়ি সহজ গলায় কথা কহিয়াছিল। ব্রজেশ্বর বড় বিস্মিত হইলেন—"সে কি ? এ গলা ত চেনা গলাই বটে।" সাহস করিয়া ব্রজেশ্বর পাঁচকড়ির মুখ ঢাকা রুমালখানা খুলিয়া লইলেন। পাঁচকড়ি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ কি ? তুমি—তুমি সাগর ?"

পাঁচকড়ি বলিল, "আমি সাগর। গঙ্গা নই—যমুনা নই—বিল নই—খাল নই—সাক্ষাৎ সাগর। তোমার বড় অভাগ্য—না ? যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে, তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিতেছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হইয়া পা টিপিতে বলিয়াছিলাম, তখন রাগে গর্‌গর্ করিয়া চলিয়া গেলে! যাক্, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ। এখন আমার মুখপানে চাহিয়া দেখিতে পার, আমায় ত্যাগ কর, আর পায়ে রাখ—এখন জানিলে আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া রহিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাগর! তুমি এখানে কেন ?"

সাগর বলিল, "সাগরের স্বামী! তুমিই বা এখানে কেন ?"

ব্রজ। তাই কি ? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী ? আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে। তোমাকেও কি ধরিয়া আনিয়াছে ?

সাগর। আমি কয়েদী নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই! আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী রাণীর সাহায্য লইয়াছি। তোমাকে দিয়া আমার পা টিপাইব বলিয়া দেবী রাণীর রাজ্যে বাস করিতেছি।

তখন নিশি আসিল। ব্রজেশ্বর তাহার বস্ত্রালঙ্কারের জাঁকজমক দেখিয়া মনে করিলেন, "এই দেবী চৌধুরাণী।" ব্রজেশ্বর সম্ভ্রম রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিশি বলিলেন, "স্ত্রীলোক ডাকাইত হইলেও তাহার অত সম্মান করিতে নাই—আপনি বসুন। এখন শুনিলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাইতি করিয়াছি ? এখন সাগরের পণ উদ্ধার হইয়াছে ; এখন আপনাতে আর আমাদের প্রয়োজন

নাই, আপনি আপনার নৌকায় ফিরিয়া যাইলে কেহ আটক করিবে না। আপনার জিনিষপত্র এক কপর্দ্দক কেহ লইবে না, সব আপনার বজরায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই একটা কপর্দ্দক—এই পোড়ারমুখী সাগর, ইহার কি হইবে।”

ব্রজেশ্বর বিহ্বল হইলেন। তবে ডাকাইতি সব মিথ্যা! এরা ডাকাইত নয়! ব্রজেশ্বর ক্ষণেক ভাবিলেন, ভাবিয়া শেষে বলিলেন, “তোমরা আমায় বোকা বানাইলে। আমি মনে করিয়াছিলাম, দেবী চৌধুরাণীর দল আমার বজরায় ডাকাইতি করিয়াছে।”

তখন নিশি বলিল, “সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন—”

কথা শেষ হইতে না হইতেই ব্রজেশ্বর বলিলেন, “দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন—তবে আপনি কি দেবী রাণী নন?”

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রাণীজীকে দেখিতে চান, তিনি দর্শন দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাইতি করি, কিন্তু আপনার উপর ডাকাইতি করিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ী যায় কি প্রকারে? প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা হইল।

ব্রজ। আসিল কি প্রকারে?

নিশি। রাণীজীর সঙ্গে।

ব্রজ। আমিও ত সাগরের পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—সেখান হইতেই আসিতেছি। কই, সেখানে ত রাণীজীকে দেখি নাই?

নিশি। রাণীজী আপনার পরে সেখানে গিয়াছিলেন।

ব্রজ। তবে ইহার মধ্যে এখানে আসিলেন কি প্রকারে।

নিশি। আমাদের ছিপ দেখিয়াছেন ত? পঞ্চাশ বোটে।

ব্রজ। তবে আপনারই কেন ছিপে করিয়া সাগরকে রাখিয়া আসুন না?

নিশি। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাহাকেও না বলিয়া

রাণীর সঙ্গে আসিয়াছে—এজন্য অন্য লোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে? আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্রজ। ভাল, তাই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছিপ হুকুম করিয়া দিন।

নিশি। ছিপ আপনারই। কিন্তু কুটুম্বকে স্বস্থানে পাইয়া আমরা আদর করিলাম না—কেবল অপমানই করিলাম, এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাইত বলিয়া আমাদের কি হিন্দুয়ানি নাই? তারপর সাগরকে বলিল, "তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস, কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।"

ব্রজেশ্বরের মুখ শুকাইল, "সর্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার! ঐটি মাপ করিও।"

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না—সাগর তাড়াতাড়ি আর এক কামরায় একখানি বড় ভারি পুরু আসন পাতিয়া চারি পাঁচখানা রূপার থালে সামগ্রী সাজাইয়া ফেলিল। স্বর্ণ-পাত্রে উত্তম সুগন্ধি শীতল জল রাখিয়া দিল। জানিতে পারিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে বলিল, "ঠাঁই হইয়াছে —উঠ।"

ব্রজেশ্বর উঁকি মারিয়া দেখিয়া নিশির কাছে যোড়হাত করিলেন, বলিলেন, "ডাকাইতি করিয়া ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়াছ—সে অত্যাচার সহিয়াছে—কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সহিবে না—দোহাই।"

স্ত্রীলোকেরা মার্জ্জনা করিল না। ব্রজেশ্বর অগত্যা কিছু খাইলেন। সাগর তখন নিশিকে বলিল, "ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।"

নিশি বলিল, "দক্ষিণা রাণী স্বয়ং দিবেন, এসো ভাই, রাণী দেখিবে এসো।" এই বলিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে আর এক কামরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশি ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, শয়নঘর দরবার কামরার মত অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত। বেশীর ভাগ, একখানা সুবর্ণমণ্ডিত মুক্তার ঝালরযুক্ত ক্ষুদ্র পালঙ্ক আছে। কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে সকল দিকে চক্ষু ছিল না। এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী প্রথিতনাম্নী দেবীকে দেখিবেন। দেখিলেন, কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক। নিশি ও সাগরে, ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এ স্থিরা, ধীরা, নিম্নদৃষ্টি, লজ্জাবনতমুখী। নিশি ও সাগর, বিশেষতঃ নিশি সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারমণ্ডিতা, বহুমূল্য বসনে আবৃতা—কিন্তু ইহার ত কিছুই নাই।

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিলে, দেবী গাত্রোত্থান করিয়া ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইলেন—কই, আর কেহ ত প্রণাম করে নাই? দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বর দেখিলেন, যথার্থ দেবীমূর্ত্তি!

প্রণাম করিয়া, নিম্ননয়নে দেবী বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি, শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "আমার উপকারই করিয়াছেন!"

দেবী আরও বলিল, "আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্য্যাদা স্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

পালঙ্কের পাশে একটি রূপার কলসী ছিল—তাহা টানিয়া বাহির করিয়া, দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল, বলিল, "ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।"

ব্রজ। কিন্তু একটা কথা আছে—

কথাটা কি, দেবী বুঝিল, বলিল—"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি ডাকাইতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোন সংশয় করিবেন না।"

ব্রজেশ্বর সম্মত হইলেন। কিন্তু কলসীটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর তুলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এ কি এ? এতে কি আছে?"

কলসীতে ব্রজেশ্বর হাত পুরিয়া তুলিল—মোহর। কলসী মোহরে পরিপূর্ণ।

ব্রজ। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শ।

ব্রজ। তেত্রিশ শ মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্রজ। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিতেছি।

ব্রজ। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধ হয় চুরি ডাকাতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম্ম হয় না; কেন না, এ টাকা নহিলে আমার বাপের জাতি রক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পাইলেই হইল।

ব্রজ। আমার টাকা জুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতেও পারিবে না।

ব্রজ। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় আসিবেন? আমি এক স্থানে থাকি না।

ব্রজ। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্রজ। আমি মাঘ ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশী করিয়া সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকিব। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইলেন। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, পরিচারিকারা মোহরের ঘড়া ছিপে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বরও দেবীকে আশীর্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিলেন। তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা বাকি আছে। এত কর্জ্জ দিলাম —মর্য্যাদা দিলাম কই?"

ব্রজ। কলসীটা মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা নহে। যথাসাধ্য মর্য্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙ্গুল হইতে একটা আঙ্গট খুলিল। ব্রজেশ্বর তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহাস্য বদনে হাত পাতিলেন। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিল।

ব্রজেশ্বর আর অপেক্ষা করিলেন না। সাগরকে সঙ্গে করিয়া একেবারে ছিপে গিয়া উঠিলেন।

এদিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেই, দেবী বলিল, এখন বজরা খুলিয়া দিতে বল। চার পাল উঠাও।

তখন সেই জাহাজের মত বজরা চারিখানা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিলেন। সাগরের সঙ্গে কথা কহেন না। দেখিলেন, দেবীর বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল। তখন ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বজরা কোথায় গেল?"

সাগর বলিল, "তা দেবী ভিন্ন আর কেহ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাহাকেও বলে না।"

ব্রজ। দেবী কে?

সা। দেবী—দেবী।

ব্রজ। তোমার কে হয়?

সা। ভগিনী।

ব্রজ। কি রকম ভগিনী?

সা। জ্ঞাতি।

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিলেন। মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বড় বজরার সঙ্গে যাইতে পার?"

মাঝিরা বলিল, "সাধ্য কি! ও নক্ষত্রের মত ছুটিয়াছে।"

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিলেন। সাগর ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, ব্রজেশ্বর বজরা খুলিয়া চলিল। সূর্য্যোদয় হইলে, সাগর আসিয়া ব্রজেশ্বরের কাছে বসিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী কি ডাকাইতি করে?"

সা। তোমার কি বোধহয় ?

ব্রজ। ডাকাইতির সমান ত সব দেখিলাম—ডাকাইতি করিলে করিতে পারে, তাও দেখিলাম। তবু বিশ্বাস হয় না যে, ডাকাইতি করে।

সা। তবু কেন বিশ্বাস হয় না ?

ব্রজ। কে জানে! ডাকাইতি না করিলেই বা এত ধন কোথায় পাইল ?

সা। কেহ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পাইয়াছে, কেহ বলে, মাটির ভিতর পোঁতা টাকা পাইয়াছে, কেহ বলে, দেবী সোনা করিতে জানে।

ব্রজ। দেবী কি বলে ?

সা। দেবী বলে, এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্রজ। পরের ধন এত পাইল কোথায় ?

সা। তা কি জানি!

ব্রজ। পরের ধন হ'লে, অত আমিরী করে ? পরে কিছু বলে না ?

সা। দেবী কিছু আমিরী করে না। খুদ খায়, মাটিতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখলে, সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র—কেবল দোকানদারি। তোমার হাতে ও কি ?

সাগর ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে নূতন আঙ্গটি দেখিল।

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া, দেবী আমাকে এই আঙ্গটি মর্য্যাদা দিয়াছে।"

সা। দেখি।

ব্রজেশ্বর আঙ্গটি খুলিয়া দেখিতে দিলেন।

সাগর হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। বলিল, "ইহাতে দেবী চৌধুরাণীর নাম লেখা আছে।"

ব্রজ। কই ?

সা। ভিতরে—ফারসীতে।

ব্রজ। (পড়িয়া) এ কি ? এ যে আমার নাম—আমার আঙ্গটি ? সাগর! তোমাকে আমার দিব্য, যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা না কও। আমায় বল, দেবী কে ?

সা। তুমি চিনিতে পার নাই, সে কি আমার দোষ ? আমি ত এক দণ্ডে চিনিয়াছিলাম।

ব্রজ। কে! কে! দেবী কে ?

সা। প্রফুল্ল।

আর ব্রজেশ্বর কথা কহিল না। সাগর দেখিল, প্রথমে ব্রজেশ্বরের শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, তারপর একটা অনির্বচনীয় আহ্লাদের চিহ্ন-উচ্ছলিত সুখের তরঙ্গ, শরীরে দেখা দিল। তার পরই আবার সাগর দেখিল, সব যেন নিবিয়া গেল ; বড় ঘোরতর বিষাদ আসিয়া যেন সেই প্রভাময় কান্তি অধিকার করিল। ব্রজেশ্বর বাক্যশূন্য, স্পন্দহীন, নিমেষশূন্য। ক্রমে সাগরের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজেশ্বর চক্ষু মুদিল। দেহ অবসন্ন হইল ; ব্রজেশ্বর সাগরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। সাগর কাতর হইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কিছুই উত্তর পাইল না ; একবার ব্রজেশ্বর বলিল, "প্রফুল্ল ডাকাত! ছি!"

———

দশম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে বজরা বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া লাগিয়াছে দেখিয়া, দেবী নদীর জলে নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল —সেই চটের মত মোটা শাড়ী। কপাল ও বুক গঙ্গামৃত্তিকায় চর্চ্চিত করিল—রুক্ষ, ভিজা চুল এলাইয়া দিল। দেবী এই অনুপম বেশে এক জন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল

দেবী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াও অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌছিয়া পরিচারিকাকে বলিল, "দিবা, তুই এখানে ব'স্। আমি আসিতেছি।

এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরও গাঢ়তর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুড়ঙ্গ। পাথরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার—পাথরের ঘর। পূর্বকালে বোধহয় দেবালয় ছিল—এক্ষণে কাল সহকারে চারি পাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে নামিবার সিঁড়ি গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। দেবী অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিল।

সেই ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মিট্ মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তার আলোতে এক শিবলিঙ্গ দেখা গেল। এক ব্রাহ্মণ সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া তাহার পূজা করিতেছিল। দেবী শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের কিছু দূরে বসিল। দেখিয়া ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্ব্বক, আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "মা! কাল রাত্রে তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি ডাকাইতি করিয়াছ না কি?"

দেবী বলিল, "আপনার কি বিশ্বাস হয়?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "কি জানি?"

ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে; আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভবানী ঠাকুর।

দেবী বলিল, "কি জানি কি, ঠাকুর? আপনি কি আমায় জানেন না। দশ বৎসর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে, যত ডাকাইতি হয়, সব আমিই করি। তথাপি এক দিনের জন্য এ কাজ আমা হইতে হয় নাই—তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলিলেন কি জানি?"

ভবানী। রাগ কর কেন? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে এক দিনের

তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়—কেন না, তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে।

ভবানী। কিন্তু তুমি ত জান যে, কেবল পরকে দিবার জন্য ডাকাইতি করি। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া, বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সাও লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া দিই। এ সকল কি তুমি জান না? দেশ অরাজক, দেশে রাজ্যশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায়, কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া, রাজ্যশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম?

দেবী। রাজা রাণী, যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি, আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপে করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি। আমি এই রাণীগিরি হইতে অবসর লইতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।

ভবানী। যদি ভাল লাগে না—তবে কাল রঙ্গরাজকে ডাকাইতি করিতে পাঠাইয়াছিলে কেন? কথা যে আমার অবিদিত নাই, তাহা বলা বেশীর ভাগ।

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই, তবে অবশ্য এটাও জানেন যে, কাল রঙ্গরাজ ডাকাইতি করে নাই—ডাকাইতির ভাণ করিয়াছিল মাত্র।

ভবানী। কেন? তা আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেবী। একটা লোককে ধরিয়া আনিবার জন্য।

ভবানী। লোকটা কে?

দেবীর মুখে নামটা একটু বাধ বাধ করিল—কিন্তু নাম না করিলেও

নয়—ভবানীর সঙ্গে প্রতারণা চলিবে না। অতএব অগত্যা দেবী বলিল, "তাঁর নাম, ব্রজেশ্বর রায়।"

ভবানী। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দেবী। কিছু দিবার প্রয়োজন ছিল। তাঁর বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়া ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিয়াছি।

ভ। ভাল কর নাই। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড। খামকা আপনার বেহাইনের জাতি মারিয়াছিল—তার জাতি যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী শিহরিল। বলিল, "সে কি রকম?"

ভ। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরিবের বাগ্দী অপবাদ দিয়া বউটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। দুঃখে বউটার মা মরিয়া গেল।

দেবী। আর, বউটা?

ভ। শুনিয়াছি, খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

দেবী। আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? আমরা পরহিতব্রত নিয়েছি, যার দুঃখ দেখিব, তারই দুঃখ মোচন করিব।

ভ। ক্ষতি নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত —ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বস্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র একদিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দেবী। তবে প্রচার করুন যে, এইখানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে, তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে, প্রচার করিয়াছি।
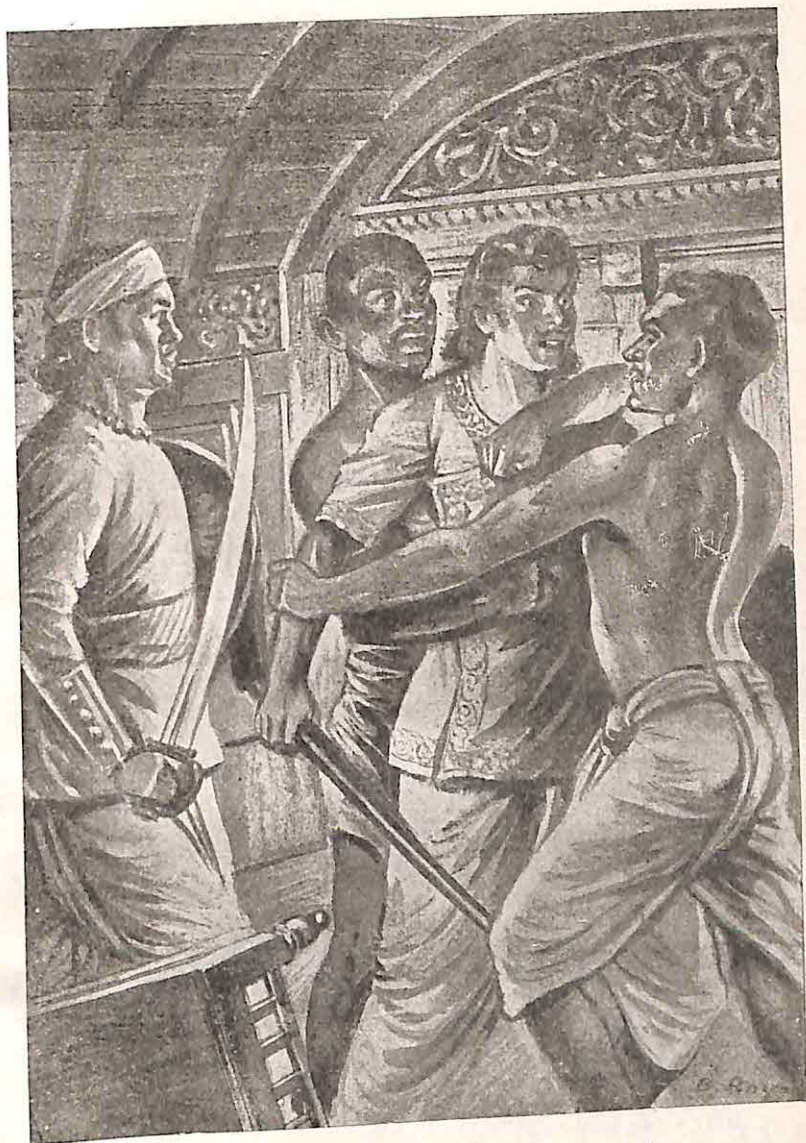
আমায় বাঁধ, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কথা বুঝাইয়া দাও।
সাদা নিশান দেখিয়াই দুই দলে যুদ্ধ বন্ধ করিলে কেন?
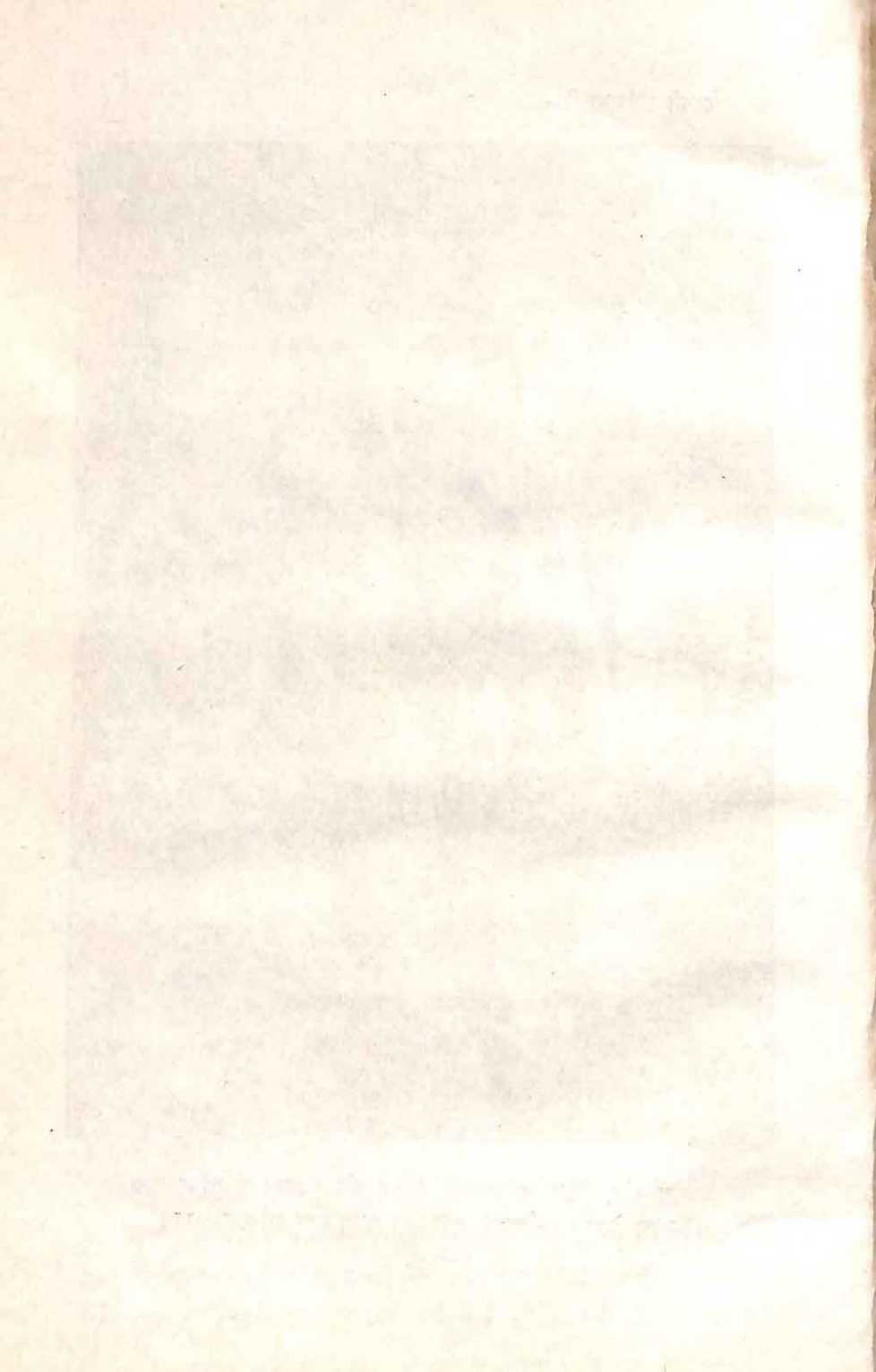
সোমবার দিন অবধারিত করিয়াছি। ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া, আজই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দেবী। এবার চলিলাম, কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কিনা সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বজরার মাস্তুলের উপর তিন-চারিখানা ছোট বড় সাদা পাল বাতাসে ফুলিতে লাগিল ; ছিপখানা বজরার সামনে আনিয়া বজরার সঙ্গে বাঁধা হইল। তাহাতে ষাট জন জোয়ান বোটে লইয়া বসিয়া 'রাণীজী কি জয়' বলিয়া বাহিতে আরম্ভ করিল—সেই জাহাজের মত বজরা তখন তীরবেগে ছুটিল।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোমবার প্রাতঃসূর্য্য-প্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর "দরবার" বা "এজলাস"। সে এজলাসে কোন মামলা-মোকদ্দমা হইত না। রাজকার্য্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল ; কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে—কিন্তু বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহার মাঝখানে দেবী রাণীর এজলাস। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার দাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মস্‌নদ পাতা, তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষায় আজ

বিশেষ জাঁক। সাড়ী পরা। সাড়ীখানার ফুলের মাঝে মাঝে এক একখানা হীরা। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালের প্রকৃত দেবীপ্রতিমার মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি, তুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার বড় জাঁকের পোষাক করিয়া বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক—বরকন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচ শত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের তুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলের সুসজ্জিত লাল পাগড়ি, লাল অঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল-সড়কী। চারিদিকে লাল নিশান পোতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একেবারে "দেবী রাণীকি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপর দশ জন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতি গান করিল। তারপর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক এক জন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসন-সমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল, কেন না, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেই জন্য কেহ কখন তাঁর সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবী দরিদ্রদিগকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্য্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।

কিছুদিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুডল্যাড্ সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রজেশ্বর তাঁর পদবন্দনা করিলেন।

হরবল্লভ অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসল সংবাদ কি? টাকার কি হইয়াছে?"

ব্রজেশ্বর বলিলেন যে, তাহার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই।

হরবল্লভের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—হরবল্লভ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে টাকা পাও নাই?"

"আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পাইয়াছি—"

হরবল্লভ। পেয়েছ? তা আমায় এতক্ষণ বল নাই? দুর্গা, বাঁচ্লেম!

ব্রজ। টাকাটা যে স্থানে পাইয়াছি, তাহাতে সে গ্রহণ করা উচিত কি না, বলা যায় না।

হর। কে দিল?

ব্রজেশ্বর অধোবদনে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তার নামটা মনে আস্‌ছে না—সেই যে মেয়ে ডাকাইত একজন আছে?"

হর। কে,—দেবী চৌধুরাণী?

ব্রজ। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পাইলে কি প্রকারে?

ব্রজেশ্বর বলিলেন, “ও টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে।”

হর। বদ্‌লোকের টাকা। লেখাপড়া কি রকম হইয়াছে?

ব্রজ। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া লেখাপড়া করিতে হয় নাই।

বাপ আর এ বিষয়ে বেশী খোঁচাখুঁচি করিয়া জিজ্ঞাসা না করে এ অভিপ্রায়ে ব্রজেশ্বর তখনই কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন, “পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকাটা লওয়া আমার তেমন মত নয়।”

হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “টাকা নেব না ত—ফাটকে যাব না কি? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা পুণ্যের টাকা কি? আর জপতপের টাকাই বা কার কাছে পাব? সে আপত্তি করে কাজ নাই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে, ডাকাইতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া করে নাই—ভয় হয়, পাছে দেরী হ'লে, বাড়ীঘর লুঠপাট করিয়া লইয়া যায়।”

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন।

হর। তা টাকার মিয়াদ কত দিন?

ব্রজ। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত।

হর। তা সে হলো ডাকাইত। দেখা দেয় না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, টাকা পাঠাইয়া দিব?

ব্রজ। ঐদিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায় থাকিবে। সেইখানে টাকা পৌঁছাইলেই হইবে।

হরবল্লভ বলিলেন, “তা, সেই দিন সেইখানেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।”

ব্রজেশ্বর বিদায় হইল। হরবল্লভ তখন মনে মনে বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। শেষে স্থির করিলেন, “হ্যাঁঃ। সে বেটীর আবার টাকা শোধ দিতে যাবে! বেটীকে

সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পল্টন শুদ্ধ তার বজরায় না উঠে-ত আমার নাম হরবল্লভই নয়। তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না।"

হরবল্লভ এই পুণ্যময় অভিসন্ধিটা আপনার মনে মনেই রাখিলেন —ব্রজেশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

এদিকে সাগর আসিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে গিয়া গল্প করিল যে, ব্রজেশ্বর একটা রাজরাণীর বজরায় গিয়া, তাহাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে,—সাগর অনেক মানা করিয়াছিল, তাহা শুনে নাই। সে জেতে কৈবর্ত্ত—সুতরাং ব্রজেশ্বরের জাতি গিয়াছে। সাগর আর ব্রজেশ্বরের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিবে না, ইহা স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

ব্রহ্মঠাকুরাণী এ সকল কথা ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করায় ব্রজেশ্বর অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, "রাণীজী জাত্যংশে ভাল—আমার পিতাঠাকুরের পিসী হয়।"

ব্রহ্মঠাকুরাণী বুঝিল, কথাটা মিথ্যা।

———

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবী রাণীর ঋণ পরিশোধের কোন উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থসংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেদিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুই চারি বার এ কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হরবল্লভ তাহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এদিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা—দুই চারি দিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।" হরবল্লভ শিবিকারোহণে গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু সে আর এক রকম। তিনি বরাবর রঙ্গপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্টরই শান্তিরক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে সিপাহী দিন। আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন বলুন।"

শুনিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন। তিনি পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং সিপাহীকে হুকুম দিলেন। হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট, ব্রেনান্‌ সিপাহী লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের নিকট সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, ঠিক সে ঘাটে দেবীকে পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ দেবী বজরাতেই থাকিবে। লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌ সেই জন্য কতক ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। আর কতক সিপাহী সৈন্য লুক্কায়িতভাবে, বন দিয়া বন দিয়া তটপথে

পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিলেন, সেইখানে তীরবর্ত্তী বনমধ্যে ফৌজ তিনি লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিবেন।

সন্ন্যাসিনী রমণীকে ধরিবার জন্য এইরূপ ঘোরতর আড়ম্বর হইল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা এ আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর যাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবেরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম "বরকন্দাজ"। অনেক সময়ে কোম্পানির সিপাহীদিগকে এই বরকন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছে, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিতহস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই! তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল, খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ,—হায়! কত বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালার আব্রুপরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। শত্রু তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সরদারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে—সমাজ-শাসনভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে! তুমি, লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র। ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুরভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর, কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর

নাই। শুনিতে পাই, সে কালে তুমি না কি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, “মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্।” এখন মূর্খের ঔষধ “বাপু” “বাছা”—তাহাতেও রোগ ভাল হয় না।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার লাঠির ভয়ে এত সিপাহীর সমাগম, তার কাছে একখানি লাঠিও ছিল না। নিকটে একটি লাঠিয়ালও ছিল না। দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে।

সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজান, দেবী ছাদের উপর বসিয়া আছে। এমন সময়ে একখানা পান্সী আসিয়া বজরার গায়ে লাগিল। পান্সীতে ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর লাফাইয়া বজরায় উঠিয়া পান্সী তফাতে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। পান্সী-ওয়ালা তাহাই করিল।

ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে, প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনত মস্তকে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, “আজ টাকা আনিতে পারি নাই, দুই চারি দিনে দিতে পারিব বোধ হয়। দুই চারি দিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।”

দেবী উত্তর করিল, “আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না ; কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে, ঐ টাকা, গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলে আমি পাইব।”

ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল। বলিল, “প্রফুল্ল, তোমার টাকা—”

ছাই টাকা! কথা শেষ হইল না—মুখের কথামুখে রহিল। যেমন

ব্রজেশ্বর "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে, অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখের জলের স্রোত ছুটিল। ব্রজেশ্বরের ছাই টাকার কথা সে স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "দেখ প্রফুল্ল, তোমার টাকা আমার টাকা, তার পরিশোধের জন্য আমি কেন কাতর হব? কিন্তু—"

প্রফুল্ল বলিল, "কিন্তু কি?—ডাকাইতি করি?"

ব্রজ। কর না কি?

ইহার উত্তরে প্রফুল্ল একটা কথা বলিতে পারিত। যখন ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমি অন্নের কাঙ্গাল, তোমরা তাড়াইয়া দিলে— আমি কি করিয়া খাইব?' তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, 'চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও!' প্রফুল্ল সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও নহে। আজ প্রফুল্লের সেই উত্তর ছিল—আমি গুরুজনের আজ্ঞাই পালন করিতেছি।

কিন্তু প্রফুল্ল সে কথা মুখেও আনিল না। স্বামীর কাছে হাত যোড় করিয়া উত্তর দিল, "আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তবে জানি, লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে, তাও জানি। সেই কথা তোমাকে আমার কাছে শুনিতে হইবে। সেই কথা শুনাইব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। আজ না শুনিলে, আর শুনা হইবে না। শোন, আমি বলি।"

তখন—যে দিন প্রফুল্ল শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনার কাহিনী সকলই অকপটে বলিল। প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "এখন পায়ের ধূলা দিয়া এ জন্মের মত আমায় বিদায় দাও। আর এখানে বিলম্ব করিও না—সম্মুখে কোন বিঘ্ন আছে। তোমায় এই দশ বৎসরের পরে পাইয়া এখনই উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি; ইহাতে বুঝিবে যে, বিঘ্ন বড় সামান্য নহে। আমার দুইটি সখী এই নৌকায় আছে। তোমার নৌকায় তাহাদের

লইয়া যাও। বাড়ী পৌঁছিয়া, তারা যেখানে যাইতে চায়, সেইখানে পাঠাইয়া দিও। আমায় যেমন মনে রাখিয়াছিলে, তেমনি মনে রাখিও। সাগর যেন আমায় না ভুলে।"

ব্রজেশ্বর ক্ষণেক কাল নীরবে ভাবিল। পরে বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রফুল্ল! আমায় বুঝাইয়া দাও। তোমার এত লোক—কেহ নাই। বজরার মাঝিরা পর্য্যন্ত নাই। কেবল দুইটি স্ত্রীলোক আছে, তাদেরও বিদায় করিতে চাহিতেছ। সম্মুখে বিঘ্ন বলিতেছ—আমাকে থাকিতে নিষেধ করিতেছ। আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হইবে না বলিতেছ। এ সব কি? সম্মুখে কি বিঘ্ন আমাকে না বলিলে, আমি যাইব না। বিঘ্ন কি, শুনিলেও যাইব কি না, তাও বলিতে পারি না।"

প্রফুল্ল। সে সব কথা তোমার শুনিবার নয়।

ব্রজ। তবে আমি কি তোমার কেহ নই?

এমন সময় দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুম্ করিয়া একটি বন্দুকের শব্দ হইল—ব্রজেশ্বরের মুখের কথা মুখেই রহিল, দুইজনে চমকিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, দূরে পাঁচখানা ছিপ আসিতেছে, বটিয়ার তাড়নে জল চাঁদের আলোয় জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে দেখা গেল পাঁচখানা ছিপ সিপাহী-ভরা। ডাঙ্গা-পথের সিপাহীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তারই সঙ্কেত বন্দুকের শব্দ। শুনিয়াই পাঁচখানা ছিপ খুলিয়াছিল। দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, "আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না। শীঘ্র আপনার পাল্কীতে উঠিয়া চলিয়া যাও।"

ব্রজ। কেন? ছিপগুলো কিসের? বন্দুক কিসের?

প্র। না শুনিলে যাইবে না ?

ব্রজ। কোনমতেই না।

প্র। এ ছিপে কোম্পানির সিপাহী আছে। এ বন্দুক ডাঙ্গা হইতে কোম্পানির সিপাহী আওয়াজ করিল।

ব্রজ। কেন এত সিপাহী এদিকে আসিতেছে ? তোমাকে ধরিবার জন্য ?

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব্ব হইতে এই সংবাদ জানিতে।"

প্র। জানিতাম। আমার চর সর্ব্বত্র আছে।

ব্রজ। এ ঘাটে আসিয়া জানিয়াছ, না আগে জানিয়াছ ?

প্র। আগে জানিয়াছিলাম।

ব্রজ। তবে, জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন ?

প্র। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

ব্রজ। তোমার লোকজন কোথায় ?

প্র। বিদায় দিয়াছি। তারা কেন আমার জন্য মরিবে ?

ব্রজ। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ ?

প্র। আর বাঁচিয়া কি হইবে ? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন্ কাজ করিব বা কোন্ সাধ মিটাইব ? আর বাঁচিব কেন ?

ব্রজ। বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া, আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ ?

ব্রজ। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন ?

ব্রজ। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন ?

ব্রজ। কাল শুনিলে কি হইত?

প্র। তাহা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে?

ব্রজ। এখন?

প্র। এখন আর উপায় নাই। তোমার পান্সী ডাকো—নিশি ও দিবাকে লইয়া শীঘ্র যাও।

ব্রজেশ্বর আপনার পান্সী ডাকিল। পান্সীওয়ালা নিকটে আসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "তোরা শীঘ্র পালা, ঐ কোম্পানির সিপাহীর ছিপ আসিতেছে, তোদের দেখিলে উহারা বেগার ধরিবে। শীঘ্র পালা, আমি যাইব না, এইখানে থাকিব।"

পান্সীর মাঝি মহাশয়, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ পান্সী খুলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর চেনা লোক, টাকার ভাবনা নাই।

পান্সী চলিয়া গেল দেখিয়া, প্রফুল্ল বলিল, "তুমি গেলে না?"

ব্রজ। কেন, তুমি মরিতে জান, আমি জানি না? তুমি আমার স্ত্রী—আমি তোমায় শত বার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপদ্‌কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

"তবে, কাজেই আমি স্বীকার করিলাম, প্রাণরক্ষার যদি কোন উপায় হয়, তা আমি করিব।" এই বলিতে বলিতে প্রফুল্ল আকাশ-প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে যেন কিছু ভরসা হইল—আবার তখনই নির্ভরসা হইয়া বলিল, "কিন্তু আমার প্রাণরক্ষায় আর এক অমঙ্গল আছে।"

ব্রজ। কি?

প্র। এ কথা তোমায় বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলিলে নয়। এই সিপাহীদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়িলে তাঁর বিপদ্ ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

ব্রজেশ্বর শিহরিল—মাথায় করাঘাত করিল। বলিল, "তিনিই কি গোইন্দা?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বরের বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। এখানে আজিকার রাত্রে যে দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এ কথা হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আর কাহারও কাছে এ কথা বলেন নাই; দেবীরও যে গূঢ় মন্ত্রণা, আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, দেবী এ ঘাটে আসিবার আগেই কোম্পানির সিপাহী রঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; নহিলে ইহারই মধ্যে পৌঁছিত না, আর ইতিপূর্ব্বেই হরবল্লভ কোথায় যাইতেছেন, কাহারও কাছে প্রকাশ না করিয়া দূরযাত্রা করিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। কথাটা বুঝিতে দেরী হইল না। তাই হরবল্লভ টাকা পরিশোধের কোন উদ্যোগ করেন নাই। তথাপি ব্রজেশ্বর ভুলিলেন না যে,

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিলেন, "আমি মরি, কোন ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে, আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

প্র। সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে, আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।

এই কথা দেবী আন্তরিক বলিয়াছিল। হরবল্লভ প্রফুল্লের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত; তবু দেবী তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।

কিন্তু এ সময়ে তীরবর্ত্তী অরণ্যমধ্য হইতে গভীর তূর্য্যধ্বনি হইল। দুই জনেই চমকিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবী ডাকিল, "নিশি!"

নিশি ছাদের উপর আসিল।

দেবী। কার ভেরী ঐ?

নিশি। যেন রঙ্গরাজের বলিয়া বোধ হয়।

দেবী। সে কি? আমি রঙ্গরাজকে প্রাতে দেবীগড় পাঠাইয়াছি।

নিশি। বোধহয়, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেবী। রঙ্গরাজকে ডাক।

ব্রজেশ্বর বলিল, "এখান হইতে ডাকিলে ডাক শুনিতে পাইবে না, আমি নামিয়া গিয়া খুঁজিয়া আনিতেছি।"

দেবী বলিল, "কিছু করিতে হইবে না, তুমি একটু নীচে গিয়া নিশির কৌশল দেখ।"

নিশি ও ব্রজ নীচে আসিল। নিশি নীচে গিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল। অনতিবিলম্বে রঙ্গরাজ বজরায় আসিয়া উঠিয়া দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিল।

এই সময়ে ব্রজেশ্বর মুখ বাড়াইয়া দেখিল, জঙ্গলের ভিতর হইতে অগণিত মনুষ্য বাহির হইতেছে। নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "উহারা কারা? সিপাই?"

নিশি বলিল, "বোধ হয় উহারা বরকন্দাজ। রঙ্গরাজ আনিয়া থাকিবে।"

দেবীও সেই মনুষ্যশ্রেণী দেখিতেছিল, এমন সময়ে রঙ্গরাজ আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন, রঙ্গরাজ?"

রঙ্গরাজ প্রথমে কোন উত্তর করিল না। দেবী পুনরপি বলিল, "আমি সকালে তোমাকে দেবীগড় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে যাও নাই

রঙ্গ। আমি দেবীগড় যাইতেছিলাম—পথে ঠাকুরজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

দেবী। ভবানী ঠাকুর ?

রঙ্গ। তাঁর কাছে শুনিলাম, কোম্পানির সিপাহী আপনাকে ধরিতে আসিতেছে। তাই আমরা দুই জনে বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছি।

দেবী। তোমরা কত বরকন্দাজ আনিয়াছ ?

রঙ্গ। প্রায় হাজার হইবে।

দেবী। সিপাহী কত ?

রঙ্গ। শুনিয়াছি, পাঁচ শ।

দেবী। এই পনের শ লোকের লড়াই হইলে, মরিবে কত ?

রঙ্গ। তা দুই চারি শ মরিলেও মরিতে পারে।

দেবী। ঠাকুরজিকে গিয়া বল—তুমিও শোন যে, তোমাদের এই আচরণে আমি আজ মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া পাইলাম।

রঙ্গ। কেন, মা ?

দেবী। একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মারিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্ম্মজ্ঞান নাই ? আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারি শ লোক কেন মরিবে ? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব ?

রঙ্গ। আপনি বাঁচিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে।

দেবী রাগে ঘৃণায় অধীর হইয়া বলিল, "ছি!"

সেই ধিক্কারে রঙ্গরাজ অধোবদন হইল—মনে করিল, "পৃথিবী দ্বিধা হউক, আমি প্রবেশ করি।"

দেবী তখন বিস্ফারিত নয়নে ঘৃণাস্ফুরিত কম্পিতাধরে বলিতে লাগিল, "শোন, রঙ্গরাজ! ঠাকুরজিকে গিয়া বল, এই মুহূর্ত্তে বরকন্দাজ সকল ফিরাইয়া লইয়া যাউন। তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইলে, আমি এই জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব, তোমরা কেহ রাখিতে পারিবে না।"

রঙ্গরাজ এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, "আমি চলিলাম। ঠাকুরজিকে এই সকল কথা জানাইব। তিনি যাহা ভালো বুঝিবেন, তাহা করিবেন। আমি উভয়েরই আজ্ঞাবাহী।"

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। নিশি ছাদে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল। রঙ্গরাজ গেলে, সে দেবীকে বলিল, "ভাল, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাই ইচ্ছা করিতে পার, কাহারও নিষেধ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যও ভাবিলে না?"

দেবী। ভাবিয়াছি ভগিনী। ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যা হইবার, হইবে। কিন্তু যাই হউক নিশি—এক কথা সার! আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?

নিশি গিয়া সকল কথা ব্রজেশ্বরকে শুনাইল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে আর আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারিল না; মনে মনে বলিল, "যথার্থ দেবীই বটে। আমি নরাধম! আমি আবার ইহাকে ডাকাইত বলিয়া ভৎর্সনা করিতে গিয়াছিলাম।"

এদিকে পাঁচ দিক্ হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার অতি নিকটবর্ত্তী হইল। প্রফুল্ল সেদিকে দৃকপাতও করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল! প্রফুল্ল ছিপ দেখিতেছিল না—বর্কন্দাজ দেখিতেছিল না। দূর আকাশপ্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ, অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন সেখানা একটু বাড়িল; তখন "জয় জগদীশ্বর!" বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

প্রফুল্লকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া, নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার স্বামীকে বাঁচাইব।"

নিশি। আর তুমি?

দেবী। আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। আমি যাহা বলি, যাহা করি, এখন তাহাতে বড় সাবধানে মনোযোগ দাও। তোমার আমার অদৃষ্টে যাই হৌক, আমার স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে, দিবাকে বাঁচাইতে হইবে, শ্বশুরকে বাঁচাইতে হইবে।

এই বলিয়া দেবী একটি শাঁক লইয়া ফুঁ দিল। নিশি বলিল, "তবু ভাল।"

দেবী বলিল, "ভাল কি মন্দ, বিবেচনা করিয়া দেখ। যাহা যাহা করিতে হইবে, তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তোমার উপর সব নির্ভর।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিপীলিকাশ্রেণীবৎ বর্কন্দাজের দল ত্রিস্রোতার তীর-বন সকল হইতে বাহির হইতে লাগিল। সবার হাতে ঢাল সড়কি—কাহারও কাহারও বন্দুক আছে—কিন্তু বন্দুকের ভাগ অল্প, সকলেরই পিঠে লাঠি বাঁধা—এই বাঙ্গালার জাতীয় হাতিয়ার।

বর্কন্দাজেরা দেখিল, ছিপগুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে, বজরা ঘেরিবে! বর্কন্দাজ দৌড়াইল—"রাণীজি-কি-জয়" বলিয়া, তাহারাও বজরা ঘেরিতে চলিল। তাহারা আসিয়া আগে বজরা ঘেরিল, ছিপ তাহাদের ঘেরিল। আর যে সময়ে শাঁক বাজিল, ঠিক সেই সময়ে জন কতক বর্কন্দাজ আসিয়া বজরার উপর উঠিল। তাহারা বজরার মাঝি মাল্লা—নৌকার কাজ করে, আবশ্যকমত লাঠি সড়কিও চালায়। তাহারা আপাততঃ লড়ায়ে প্রবৃত্ত হইবার কোন ইচ্ছা দেখাইল না। দাঁড়ে, হালে পালের রসি ধরিয়া, লগি ধরিয়া যাহার যে স্থান সেইখানে বসিল। আরও অনেক বর্কন্দাজ বজরায় উঠিল। তিন চারি শ বর্কন্দাজ তীরে রহিল—সেইখান হইতে ছিপের উপর সড়কি চালাইতে লাগিল। কতক সিপাহী ছিপ হইতে নামিয়া, বন্দুকে

সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। সর্ব্বত্র হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল।

দূর হইতে লড়াই হইলে সিপাহীর কাছে লাঠিয়ালেরা অধিকক্ষণ টিকিত না—কেন না, দূরে লাঠি চলে না। কিন্তু ছিপের উপর থাকিতে হওয়ায় সিপাহীদের বড় অসুবিধা হইল। যাহারা তীরে উঠিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সে সিপাহীরা লাঠিয়ালদিগকে সঙ্গীনের মুখে হটাইতে লাগিল, কিন্তু যাহারা জলে লড়াই করিতেছিল, তাহারা বরকন্দাজদিগের লাঠি সড়কিতে হাত, পা বা মাথা ভাঙিয়া কাবু হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিবার অল্পমাত্র পরেই এই ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রফুল্ল মনে করিল, হয় ভবানী ঠাকুরের কাছে আমার কথা পৌঁছে নাই—নয় তিনি আমার কথা রাখিলেন না, মনে করিয়াছেন, আমি মরিতে পারিব না। ভাল, আমার কাজটাই তিনি দেখুন।

দেবীর রাণীগিরিতে গুটিকতক চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল। তার একটি এই যে, যে সামগ্রীর কোন প্রকার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আগে গুছাইয়া হাতের কাছে রাখিতেন। এ গুণের পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। দেবী এখন হাতের কাছেই পাইলেন—একটি সাদা নিশান। সাদা নিশানটি বাহিরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে উঁচু করিয়া ধরিলেন।

সেই নিশান দেখিবামাত্র লড়াই একেবারে বন্ধ হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই হাতিয়ার ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝড় তুফান যেন হঠাৎ থামিয়া গেল, প্রমত্ত সাগর যেন অকস্মাৎ প্রশান্ত হ্রদে পরিণত হইল।

দেবী দেখিল, পাশে ব্রজেশ্বর। এই যুদ্ধের সময়ে দেবীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া, ব্রজেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। দেবী তাঁহাকে বলিল, "তুমি এই নিশান এইরূপ ধরিয়া থাক। আমি ভিতরে গিয়া নিশি ও দিবার সঙ্গে একটা পরামর্শ আঁটিব। রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে, তাহাকে বলিও, সে দরওয়াজা হইতে আমার হুকুম হয়।"

এই বলিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে নিশান দিয়া চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নিশান তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেখানে রঙ্গরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা নিশান দেখিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তুমি কার হুকুমে সাদা নিশান দেখাইলে ?"

ব্রজ। রাণীজির হুকুম।

রঙ্গ। রাণীজির হুকুম। তুমি কে ?

ব্রজ। চিনিতে পার না ?

রঙ্গরাজ একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "চিনিয়াছি। তুমি ব্রজেশ্বরবাবু ? এখানে কি মনে ক'রে ? বাপ বেটায় এক কাজে নাকি ? কেহ একে বাঁধ।"

রঙ্গরাজের ধারণা হইল যে, হরবল্লভের ন্যায় দেবীকে ধরাইয়া দিবার জন্য ব্রজেশ্বর কোন ছলে বজরায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আজ্ঞা পাইয়া দুইজন ব্রজেশ্বরকে বাঁধিতে আসিল। ব্রজেশ্বর কোন আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "আমায় বাঁধ, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কথা বুঝাইয়া দাও। সাদা নিশান দেখিয়া দুইদলে যুদ্ধ বন্ধ করিল কেন ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "কচি খোকা আর কি! জান না, সাদা নিশান দেখাইলে ইংরেজের আর যুদ্ধ করিতে নাই ?"

ব্রজ। তা আমি জানিতাম না। তা আমি জানিয়াই করি, আর না জানিয়াই করি, রাণীজির হুকুমমত সাদা নিশান দেখাইয়াছি কি না, তুমি না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আর—তোমারও আজ্ঞা আছে যে, তুমি দরওয়াজা হইতে রাণীজির হুকুম লইবে।

রঙ্গরাজ বরাবর কামরার দরওয়াজায় গেল। কামরার দরওয়াজা বন্ধ আছে দেখিয়া বাহির হইতে ডাকিল, "রাণী-মা।"

ভিতর হইতে উত্তর, "কে, রঙ্গরাজ ?"

রঙ্গ। আজ্ঞা, হ্যাঁ—একটা সাদা নিশান আমাদের বজরা হইতে দেখান হইয়াছে—লড়াই সেইজন্য বন্ধ আছে।

ভিতর হইতে—“সে আমারই হুকুম মত হইয়াছে। এখন তুমি ঐ সাদা নিশান লইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেবের কাছে যাও। গিয়া বল যে, লড়ায়ে প্রয়োজন নাই, আমি ধরা দিব।”

রঙ্গ। আমার শরীর থাকিতে তাহা কিছুতেই হইবে না।

দেবী। শরীরপাত করিয়াও আমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীরপাত করিব।

দেবী। শোন, মূর্খের মত গোল করিও না—ঐ সিপাহীর বন্দুকের কাছে লাঠি সোটা কি করিবে?

রঙ্গ। কি না করিবে?

দেবী। যাই করুক—আর এক বিন্দু রক্তপাত হইবার আগে আমি প্রাণ দিব,—বাহিরে গিয়া গুলির মুখে দাঁড়াইব—রাখিতে পারিবে না। বরং এখন আমি ধরা দিলে, পলাইবার ভরসা রহিল। বরং এক্ষণে আপন আপন প্রাণ রাখিয়া সুবিধা মত যাহাতে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সে চেষ্টা করিও। আমার অনেক টাকা আছে। কোম্পানির লোকসকল অর্থের বশ—আমার পলাইবার ভাবনা কি?

দেবী মুহূর্ত্ত জন্যও মনে করেন নাই যে, ঘুষ দিয়া তিনি পলাইবেন। সে রকম পলাইবার ইচ্ছাও ছিল না। এ কেবল রঙ্গরাজকে ভুলাইতে-ছিলেন। তাঁর মনের ভিতর যে গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, রঙ্গরাজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না—সুতরাং রঙ্গরাজকে তাহা বুঝাইলেন না।

রঙ্গরাজ বলিল, “যাহা দিয়া কোম্পানির লোক বশ করিবেন, তাহা ত বজরাতেই আছে। আপনি ধরা দিলে, ইংরেজ বজরাও লইবে।”

দেবী। সেইটি নিষেধ করিও। বলিও যে, আমি ধরা দিব, কিন্তু বজরা দিব না। বজরায় যাহা আছে, তাহার কিছুই দিব না; বজরায় যাহারা আছে, তাহাদের কাহাকেও তিনি ধরিতে পারিবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজী।

রঙ্গ। ইংরেজ যদি না শুনে, যদি বজরা লুটিতে আসে ?

দেবী। বারণ করিও—বজরায় না আসে, বজরা না স্পর্শ করে। বলিও যে, তাহা করিলে ইংরেজের বিপদ্ ঘটিবে। বজরায় আসিলে আমি ধরা দিব না। যে মুহূর্ত্তে ইংরেজ বজরায় উঠিবে, সেই দণ্ডে আবার যুদ্ধ আরম্ভ জানিবেন। আমার কথায় তিনি স্বীকৃত হইলে, তাহাদের কাহাকে এখানে আসিতে হইবে না, আমি নিজে তাঁহার ছিপে যাইব।

রঙ্গরাজ বুঝিল, ভিতরে একটা কি গভীর কৌশল আছে। দৌত্যে স্বীকৃত হইল। তখন দেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবানী ঠাকুর কোথায় ?"

রঙ্গ। তিনি তীরে বর্কন্দাজ লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। আমার কথা শোনেন নাই। বোধ করি, এখনও সেইখানে আছেন।

দেবী। আগে তাঁর কাছে যাও। সব বর্কন্দাজ লইয়া নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে যাইতে বল। বলিও যে, আমার বজরার লোকগুলি রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। আর বলিও যে, আমার রক্ষার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—আমার রক্ষার জন্য ভগবান্ উপায় করিয়াছেন। ইহাতে যদি তিনি আপত্তি করেন, আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে বলিও—তিনি বুঝিতে পারিবেন।

রঙ্গরাজ তখন স্বয়ং আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, বৈশাখী নবীন নীরদমালায় গগন অন্ধকার হইয়াছে।

রঙ্গরাজ বলিল, "মা! আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি। হরবল্লভ রায় আজিকার গোইন্দা। তার ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখিলাম। অভিপ্রায়টা মন্দ, সন্দেহ নাই। তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি।"

শুনিয়া নিশি ও দিবা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবী বলিল, "বাঁধিও না। এখন গোপনে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে বল। পরে যখন দিবা নামিতে হুকুম দিবে, তখন নামিবেন।"

আজ্ঞামত রঙ্গরাজ আগে ব্রজেশ্বরকে ছাদে বসাইল। তারপর

ভবানী ঠাকুরের কাছে গেল, এবং দেবী যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিল। রঙ্গরাজ মেঘ দেখাইল—ভবানী দেখিল—ভবানী আর আপত্তি না করিয়া, তীরের ও জলের বর্‌কন্দাজ সকল জমা করিয়া লইয়া, ত্রিস্রোতার তীরে তীরে স্বস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিল।

এদিকে দিবা ও নিশি, এই অবসরে বাহিরে আসিয়া, বর্‌কন্দাজ-বেশী দাঁড়ি মাঝিদিগকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এদিকে ভবানী ঠাকুরকে বিদায় দিয়া, রঙ্গরাজ সাদা নিশান হাতে করিয়া, জলে নামিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেবের ছিপে গিয়া উঠিল। সাদা নিশান হাতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে ছিপে উঠিলে, সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তোমরা সাদা নিশান দেখাইয়াছ, ধরা দিবে ?"

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব কি ? যাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছেন, তিনিই ধরা দিবেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছি।

সাহেব। দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন ?

রঙ্গ। দিবেন। তাই বলিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সাহেব। আর তোমরা ?

রঙ্গ। আমরা কারা ?

সা। দেবী চৌধুরাণীর দল।

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব না।

সা। আমি দলশুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

রঙ্গরাজ বলিল, "আমি অত জানি না। আমায় আমাদের প্রভু যা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। বজরা পাইবেন না, বজরায় যে ধন, তাহা পাইবেন না, আমাদের কাহাকেও পাইবেন না। কেবল দেবী রাণীকে পাইবেন।"

সা। কেন ?

রঙ্গ। তা জানি না।

সা। জান আর নাই জান, বজরা এখন আমার, আমি উহা দখল করিব।

রঙ্গ। সাহেব, বজরাতে উঠিও না, বজরা ছুঁইও না, বিপদ ঘটিবে।

সা। পুঃ। পাঁচ শ সিপাহী লইয়া তোমাদের জন দুই চারি লোকের কাছে বিপদ্। এই বলিয়া সাহেব সাদা নিশান ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদের হুকুম দিলেন, "বজরা ঘেরাও কর।"

সিপাহীরা বজরা ঘেরিয়া ফেলিল। তখন সাহেব বলিলেন, "বজরার উপর উঠিয়া বর্কন্দাজদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লও।" এ হুকুম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে দিলেন। কথা দেবীর কানে গেল। দেবীও বজরার ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে হুকুম দিলেন, "বজরায় যাহার যাহার হাতে হাতিয়ার আছে, সব জলে ফেলিয়া দাও।"

শুনিবামাত্র, বজরায় যাহার যাহার হাতে অস্ত্র ছিল, সব জলে ফেলিয়া দিল। রঙ্গরাজও আপনার অস্ত্র সকল জলে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "চল, এখন বজরায় গিয়া দেখি, কে আছে ?"

এই বলিয়া সাহেব একজন মাত্র সিপাহী সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন। এটা বিশেষ সাহসের কাজ নহে ; কেন না বজরার উপর যে কয়জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। সাহেব বুঝেন নাই যে, দেবীর স্থিরবুদ্ধিই শাণিত মহাস্ত্র ; তার অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

সাহেব রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার দরজায় আসিলেন। দ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে দুই জনেই বিস্মিত হইলেন।

দেখিলেন, যেদিন প্রথম ব্রজেশ্বর বন্দী হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইদিন যেমন ইহার মনোহর সজ্জা, আজিও সেইরূপ, দেয়ালে তেমনি চারু চিত্র। তেমনি সুন্দর গালিচা পাতা। তেমনি

আতরদান, গোলাবপাশ, তেমনি সোণার পুষ্পপাত্রে ফুল ভরা, সোণার আলবোলায় তেমনি মৃগনাভিগন্ধি তামাকু সাজা। তেমনি রূপার পুতুল, রূপার ঝাড়, সোণার শিকলে দোলান সোণার প্রদীপ। কিন্তু আজ একটা মসনদ নয়—দুইটা। দুইটা মসনদের উপর সুবর্ণমণ্ডিত উপাধানে দেহ রক্ষা করিয়া দুইটি সুন্দরী রহিয়াছে। তাহাদের পরিধানে মহার্ঘ বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নভূষা। সাহেব তাদের চেনেন না—রঙ্গরাজ চিনিল যে, একজন নিশি—আর একজন দিবা।

সাহেবের জন্য একখানা রূপার চৌকি রাখা হইয়াছিল, সাহেব তাহাতে বসিলেন। রঙ্গরাজ খুঁজিতে লাগিল, দেবী কোথা? দেখিল, কামরার এক ধারে দেবীর সহজ বেশে দেবী দাঁড়াইয়া আছে, গড়া পরা, কেবল কড় হাতে, এলোচুল, কোন বেশভূষা নাই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দেবী চৌধুরাণী? কাহার সঙ্গে কথা কহিব?"

নিশি বলিল, "আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। আমি দেবী।"

দিবা হাসিয়া বলিল, "ইংরেজ দেখিয়া রঙ্গ করিতেছিস? এ কি রঙ্গের সময়? লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব! আমার এই ভগিনী কিছু রঙ্গতামাসা ভালোবাসে, কিন্তু এ তার সময় নয়। আপনি আমার সঙ্গে কথা কহিবেন—আমি দেবী চৌধুরাণী।"

নিশি বলিল," আ মরণ! তুই কি আমার জন্য ফাঁসি যেতে চাস্‌ না কি?" সাহেবের দিকে ফিরিয়া নিশি বলিল, "সাহেব, ও আমার ভগিনী—বোধ হয়, স্নেহবশতঃ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে প্রতারণা করিতেছে। চলুন, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন, যাইতেছি। আমিই দেবী রাণী।"

দিবা বলিল, "সাহেব! তোমার যীশু খৃষ্টের দিব্য, তুমি যদি নিরপরাধিনীকে ধরিয়া লইয়া যাও। আমি দেবী।"

সাহেব বিরক্ত হইয়া রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "একি তামাসা? কে দেবী চৌধুরাণী, তুমি যথার্থ বলিবে?"

রঙ্গরাজ কিছু বুঝিল না, কেবল অনুভব করিল যে, ভিতরে একটা

কি কৌশল আছে। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া সে নিশিকে দেখাইয়া, হাতজোড় করিয়া বলিল, "হুজুর! এ-ই যথার্থ দেবী রাণী।"

তখন দেবী প্রথম কথা কহিল। বলিল, "আমার ইহাতে কথা কহা বড় দোষ। কিন্তু কি জানি, এর পর মিছা কথা ধরা পড়িলে যদি সকলে মারা যায়, তাই বলিতেছি এ ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য নহে।" পরে নিশিকে দেখাইয়া বলিল, "এ দেবী নহে। যে উহাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে রাণীজিকে মা বলে, রাণীজিকে মার মত ভক্তি করে, এই জন্য সে রাণীজিকে বাঁচাইবার জন্য অন্য ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে।"

তখন সাহেব দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী তবে কে?"

দেবী বলিল, "আমি দেবী।"

দেবী এই কথা বলিলে, নিশিতে, দিবাতে, রঙ্গরাজ ও দেবীতে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। নিশি বলে, 'আমি দেবী', দিবা বলে, 'আমি দেবী।' রঙ্গরাজ নিশিকে বলে, 'এই দেবী', দেবী বলে, 'আমি দেবী।' বড় গোলমাল।

তখন নিশি ও দিবা দুই জনেই বলিল, "এত গোলযোগে কাজ কি? আপনার-সঙ্গে কি গোইন্দা নাই? যদি গোইন্দা থাকে, তবে তাহাকে ডাকাইলেই ত সে বলিয়া দিতে পারিবে,—কে যথার্থ দেবী চৌধুরাণী।"

হরবল্লভকে বজরায় আনিবে, দেবীর এই প্রধান উদ্দেশ্য। হরবল্লভের রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, দেবী আত্মরক্ষার উপায় করিবে না, ইহা স্থির। তাঁহাকে বজরায় না আনিতে পারিলে, হরবল্লভের রক্ষার নিশ্চয়তা হয় না।

সাহেব মনে করিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে।" তখন তাঁহার সঙ্গে যে সিপাহী আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "গোইন্দাকে ডাক।"

সিপাহী এক ছিপের একজন জমাদ্দার সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, "গোইন্দাকে ডাক।" তখন গোইন্দাকে ডাকাডাকির গোল পড়িয়া

গেল। গোইন্দা কোথায়, গোইন্দা কে, তাহা কেহই জানে না, কেবল চারিদিকে ডাকাডাকি করে।

এমন সময়ে হরবল্লভ বজরায় উঠিয়া সিপাহীকে বলিল, "গোইন্দাকে খুঁজিতেছ ? আমি গোইন্দা।"

হরবল্লভ আসিতেছে, জানিতে পারিয়া দেবী ভিতর কামরায় চলিয়া গেল।

হরবল্লভ কামরার দ্বারে উপস্থিত হইয়া, কামরার সজ্জা ও ঐশ্বর্য্য, দিবা ও নিশির রূপ ও সজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সাহেবকে সেলাম করিতে গিয়া, ভুলিয়া নিশিকে সেলাম করিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া নিশি কহিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! মেজাজ সরিফ ?"

শুনিয়া দিবা বলিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! আমায় একটা কুর্নিস হলো না—আমি হলেম এদের রাণী।"

সাহেব হরবল্লভকে বলিলেন, "ইহারা ফেরেব্ করিয়া দুইজনেই বলিতেছে, 'আমি দেবী চৌধুরাণী।' কে দেবী চৌধুরাণী, তাহার ঠিকানা না হওয়ায়, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কে দেবী ?"

হরবল্লভ বড় প্রমাদে পড়িলেন। উর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিতর কখনও দেবীকে দেখেন নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিলেন। নিশি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া 'ভুল হইয়াছে' বলিয়া হরবল্লভ দিবাকে দেখাইলেন। দিবা লহর তুলিয়া হাসিল। বিষণ্ণমনে হরবল্লভ আবার নিশিকে দেখাইল। সাহেব তখন গরম হইয়া উঠিয়া, হরবল্লভকে বলিলেন, "টোম বড্‌জাট্—শূওর। টোম পছান্‌টে নেহি ?"

তখন দিবা বলিল, "সাহেব, রাগ করিবেন না! উনি চেনেন না, উঁহার ছেলে চেনে। উঁহার ছেলে বজরার ছাদে বসিয়া আছে, তাহাকে আনুন—সে চিনিবে।"

হরবল্লভ আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "আমার ছেলে!"

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। সে এখানে কেন ?

দিবা। তিনি বলিবেন।

সাহেব হুকুম দিলেন, "তাঁহাকে আন।"

দিবা রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত করিল। তখন রঙ্গরাজ ছাদে গিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "চল, দিবা ঠাকুরাণীর হুকুম।"

ব্রজেশ্বর নামিয়া কামরার ভিতর আসিল। দেবীর হুকুম আগেই প্রচার হইয়াছিল,—দিবার হুকুম পাইলেই ব্রজেশ্বর ছাদ হইতে নামিবে। এমনই দেবীর বন্দোবস্ত!

সাহেব ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দেবী চৌধুরাণীকে চেন?"

ব্রজ। চিনি।

সাহেব। এখানে দেবী আছে?

ব্রজ। না।

সাহেব তখন রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, "সে কি, ইহারা দুই জনের এক জনও দেবী চৌধুরাণী নয়?"

ব্রজ। এরা তার দাসী।

সা। যদি এরা কেহ দেবী না হয়, তবে দেবী অবশ্য এ বজরার কোথাও লুকাইয়া আছে। বোধ হয়, দেবী সেই চাকরাণীটা। আমি বজরা তল্লাসী করিতেছি—তুমি নিশানদিহি করিবে, আইস।

ব্রজ। সাহেব, তোমরা বজরা তল্লাস করিতে হয়, কর—আমি নিশানদিহি করিব কেন?

সাহেব বিস্মিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "কেঁও বড্ জাট্? তোম গোইন্দা নেহি?"

—"নেহি।" বলিয়া ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত করিল।

—"করিলে কি? করিলে কি? সর্ব্বনাশ করিলে?" বলিয়া হরবল্লভ কাঁদিয়া উঠিল।

—"হুজুর! তুফান উঠা।" বলিয়া বাহির হইতে জোমাদ্দার হাঁকিল।

সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে শুনা গেল।

কামরার ভিতর হইতে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—যে মুহূর্ত্তে সাহেবের গালে ব্রজেশ্বরের চড় পড়িল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার শাঁক বাজিল। এবার তুই ফুঁ।

বজরার নোঙ্গর ফেলা ছিল না—খোঁটায় কাছি বাঁধা ছিল, খোঁটার কাছে দুই জন নাবিক বসিয়াছিল। যেমন শাঁক বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। পালের কাছির কাছে চারিজন নাবিক বসিয়াছিল। শাঁকের শব্দ শুনিবামাত্র তাহারা পালের কাছি সকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া চারিখানা পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তারপর ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে। সাহেব ব্রজেশ্বরের চড়ের পরিবর্ত্তে ঘুষি উঠাইয়াছেন মাত্র, ইহারই মধ্যে এতখানা সব হইয়া গেল। তাঁহারও হাতের ঘুষি হাতে রহিল, যেমন বজরা কাত হইল, অমনি সাহেব টলিয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্তে দিবা সুন্দরীর পাদমূলে পতিত হইলেন। ব্রজেশ্বর খোদ সাহেবের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল—এবং রঙ্গরাজ তাহার উপর পড়িয়া গেল। হরবল্লভ প্রথমে নিশি ঠাকুরাণীর ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে পদচ্যুত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঙ্গরাজের নাগরা জুতায় আটকাইয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, "নৌকা-খানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি। আর এখন দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে!"

কিন্তু নৌকা ডুবিল না—কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিল।

বজরা আর কেহ দেখিতে পাইল না, নক্ষত্রবেগে উড়িয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না। সিপাহী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া, পাল

উড়াইয়া চলিল, লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব ও হরবল্লভ, দেবীর নিকট বন্দী হইল। নিমেষমধ্যে যুদ্ধ জয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আমার রক্ষার উপায় ভগবান্‌ করিতেছেন।"

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বজরা জলের রাশি ভাঙ্গিয়া, দুলিতে দুলিতে নক্ষত্র বেগে ছুটিল। ব্রজেশ্বর বাহিরে গিয়া বসিল। কেবল ঝড়,—বৃষ্টি বড় নাই,—ভিজিতে হইল না। রঙ্গরাজও বাহিরে আসিয়া বসিল। দিবা উঠিয়া দেবীর কাছে গেল। নিশি উঠিল না। সাহেব আবার রূপার চৌকিতে উঠিয়া বসিলেন, হরবল্লভ বসিবার স্থান না পাইয়া, নিশি সুন্দরীর মসনদের কাছে বসিলেন।

নিশি বলিল, "আপনি একটু নিদ্রা যাইবেন ?"

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয় ?

নিশি। আজ না হইল ত আর হইল না।

হর। সে কি ?

নিশি। তুমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিলে ?

হর। তা—তা—কি জান—

নিশি। ধরা পড়িলে দেবীর কি হইত, জান ?

হর। আ—এমন কি—

নিশি। এমন কিছু নয়, ফাঁসি !

হর। তা—না—এই—তা কি জান—

নিশি। দেবী তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই, বরং ভারী উপকার করিয়াছিল—যখন তোমার জাতি যায়, প্রাণ যায়, তখন তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়া, তোমায় রক্ষা করিয়াছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাহাকে ফাঁসি দিবার চেষ্টায় ছিলে ? তোমার যোগ্য কি দণ্ড, বল দেখি ?

হরবল্লভ চুপ করিয়া রহিল।

নিশি বলিতে লাগিল, "তাই বলিতেছিলাম, এই বেলা ঘুমাইয়া লও —আর রাতের মুখ দেখিবে না। নৌকা কোথায় যাইতেছে, বল দেখি?

হরবল্লভের কথা কহিবার শক্তি নাই।

নিশি বলিতে লাগিল, "ডাকিনী শ্মশান বলিয়া এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে। আমরা যাদের প্রাণে মারি, তাদের সেইখানেই লইয়া গিয়া মারি। বজরা এখন সেইখানে যাইতেছে। সেইখানে পৌঁছিলে সাহেব ফাঁসি যাইবে, রাণীজির হুকুম হইয়া গিয়াছে। আর তোমার কি হুকুম হইয়াছে, জান?"

হরবল্লভ কাঁদিতে লাগিল,—যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমায় রক্ষা কর।"

নিশি বলিল, "তোমায় রক্ষা করিবে, এমন পাষণ্ড পামর কে আছে? তোমায় শূলে দিবার হুকুম হইয়াছে।"

হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝড়ের শব্দ বড় প্রবল, সে কান্নার শব্দ ব্রজেশ্বর শুনিতে পাইল না,—দেবীও না। সাহেব শুনিল। সাহেব কথাগুলা শুনিতে পায় নাই, কান্না শুনিতে পাইল। সাহেব ধমকাইল, "রোও মৎ—উল্লুক। মর্‌না একরোজ আলবৎ হ্যায়।"

সে কথা কানে না তুলিয়া, নিশির কাছে যোড়হাত করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "হাঁ গাঁ! আমায় কি কেউ রক্ষা করিতে পারে না গা?"

নিশি। তোমার মত নরাধমকে বাঁচাইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে? আমাদের রাণী দয়াময়ী, কিন্তু তোমার জন্য কেহই তাঁর কাছে দয়ার ভিক্ষা করিব না।

হর। আমি লক্ষ টাকা দিব।

নিশি। মুখে আনিতে লজ্জা করে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য এই কৃতঘ্নের কাজ করিয়াছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁক?

হর। আমাকে যা বলিবে, তাই করিব।

নিশি। তোমার মত লোকের দ্বারা কোন্ কাজ হয় যে, তুমি, যা বলিব, তাই করিবে ?

হর। অতি ক্ষুদ্রের দ্বারাও উপকার হয়—ওগো, কি করিতে হইবে বল, আমি প্রাণপণ করিয়া করিব—আমায় বাঁচাও।

নিশি। তোমার দ্বারাও আমার একটা উপকার হইলে হইতে পারে—তা তোমার মত লোকের দ্বারা সে উপকার না হওয়াই ভাল।

হর। তোমার কাছে যোড়হাত করিতেছি—তোমার হাতে ধরিতেছি—

নিশি। তোমার হাতে পায়ে ধরিয়া কাজ নাই—তুমি যদি এতই কাতর হইয়াছ, তবে তুমি যাতে রক্ষা পাও, আমি তা করিতে রাজী হইতেছি। কিন্তু তোমায় যা বলিব, তা যে তুমি করিবে, এ বিশ্বাস হয় না। তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোইন্দাগিরি কর। তোমার কথায় বিশ্বাস কি ?

হর। যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিতেছি।

নিশি। তোমার আবার দিব্য ? কি দিব্য করিবে ?

হর। গঙ্গাজল তামা তুলসী দাও—আমি স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতেছি।

নিশি। আচ্ছা, দিব্য করিতে হইবে না—তুমি আমাদের হাতে আছ। শোন, আমি বড় কুলীনের মেয়ে। আমাদের ঘরে পাত্র যোটা ভার। আমার ছোট বহিনের আজও বিবাহ হয় নাই।

হর। বয়স কত হইয়াছে ?

নিশি। পঁচিশ ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে—কিন্তু আর তার বিবাহ না হইলে অঘরে পড়িবে, এমন গতিক হইয়াছে। তুমি আমার বাপের পালটি ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে। আমিও এই কথা বলিয়া রাণীজির কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লই।

হরবল্লভের মাথার উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। বলিল, "আমি বুড়া হইয়াছি, আমার আর বিবাহের বয়স নাই। আমার ছেলে বিবাহ করিলে হয় না?"

নিশি। তিনি রাজী হইবেন?

হর। আমি বলিলেই হইবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আজ্ঞা দিয়া যাইবেন। তাহা হইলে, আমি পাল্কী বেহারা আনিয়া আপনাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। আপনি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করিবেন। আমরা বরের বিবাহ দিয়া বৌ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব।

হরবল্লভ হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল—কোথায় শূলে যায়—কোথায় বৌভাতের ঘটা। হরবল্লভের আর দেরি সয় না। বলিল, "তবে তুমি গিয়া রাণীজিকে এ সকল কথা জানাও।"

নিশি বলিল, "চলিলাম।" নিশি দ্বিতীয় কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

নিশি গেলে, সাহেব হরবল্লভকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীলোকটা তোমাকে কি বলিতেছিল?"

হর। এমন কিছুই না।

সাহেব। কাঁদিতেছিলে কেন?

হর। কই? কাঁদি নাই!

সাহেব। বাঙ্গালী এমনই মিথ্যাবাদী বটে।

নিশি ভিতরে আসিলে, দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার শ্বশুরের সঙ্গে এত কি কথা কহিতেছিলে?"

নিশি। দেখিলাম, যদি তোমার শাশুড়ীগিরিতে বাহাল হইতে পারি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঝড় থামিল ; নৌকাও থামিল। দেবী বজরার জানেলা হইতে দেখিতে পাইলেন, প্রভাত হইতেছে। বলিলেন, "নিশি! আজ সুপ্রভাত।"

নিশি বলিল, "আমি আজ সুপ্রভাত।"

দিবা। তুমি অবসান, আমি সুপ্রভাত।"

নিশি। যে দিন আমার অবসান হইবে, সেই দিনই আমি সুপ্রভাত বলিব। এ অন্ধকারের অবসান নাই। আমি বুঝিলাম, দেবী চৌধুরাণীর সুপ্রভাত—কেননা, আজ দেবী চৌধুরাণীর অবসান।

দিবা। ও কি কথা লো পোড়ারমুখী ?

নিশি। কথা ভাল। দেবী মরিয়াছে। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চলিল।

দেবী। তার এখন দেরী ঢের। যা বলি, কর দেখি। বজরা বাঁধিতে বল দেখি।

নিশি হুকুম জারি করিল—মাঝিরা তীরে লাগাইয়া বজরা বাঁধিল। তারপর দেবী বলিল, "রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় আসিয়াছি ? রঙ্গপুর কত দূর ? ভূতনাথ কত দূর ?"

রঙ্গরাজ জিজ্ঞাসায় বলিল, "এক রাত্রে চারি দিনের পথ আসিয়াছি। রঙ্গপুর এখান হইতে অনেক দিনের পথ। ডাঙ্গা-পথে ভূতনাথে এক দিনে যাওয়া যাইতে পারে।"

—"পাল্কী বেহারা পাওয়া যাইবে ?"

—"আমি চেষ্টা করিলে সব পাওয়া যাইবে।"

দেবী নিশিকে বলিল, "তবে আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।"

নিশি রঙ্গরাজকে ডাকিয়া, হরবল্লভের সাক্ষাতে বলিল, "সাহেবটাকে ফাঁসি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণটাকে এখন শূলে দিয়া কাজ নাই। উহাকে পাহারাবন্দী করিয়া স্নানাহ্নিকে পাঠাইয়া দাও।"

হরবল্লভ বলিল, "আমার উপর হুকুম কিছু হইয়াছে ?"

নিশি চোখ টিপিয়া বলিল, "আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। তুমি স্নানাহ্নিক করিয়া আইস।"

রঙ্গরাজ হরবল্লভকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দিল।

তখন দেবী নিশিকে বলিল, "সাহেবটাকে ছাড়িয়া দিতে বল। সাহেবকে রঙ্গপুরে ফিরিয়া যাইতে বল। রঙ্গপুর অনেক দূর, এক শত মোহর উহাকে পথখরচ দাও, নহিলে এত পথ যাইবে কি প্রকারে?

নিশি শত স্বর্ণ লইয়া গিয়া রঙ্গরাজকে দিল। আর কানে কানে উপদেশ দিল। উপদেশে দেবী যাহা বলিয়াছিল, তাহা ছাড়া আরও কিছু ছিল।

রঙ্গরাজ তখন দুইজন বর্‌কন্দাজ লইয়া আসিয়া সাহেবকে ধরিল। বলিল, "উঠ।"

সাহেব। কোথা যাইতে হইবে?

রঙ্গ। তুমি কয়েদী—জিজ্ঞাসা করিবার কে?

সাহেব বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গরাজের পিছু পিছু দুই জন বর্‌কন্দাজের মাঝে চলিল। যে ঘাটে হরবল্লভ স্নান করিতেছিল, সেই ঘাট দিয়া তাহারা যায়।

হরবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "এই জঙ্গলে।"

হর। কেন?

রঙ্গ। জঙ্গলের ভিতর গিয়া উহাকে ফাঁসি দিব।

হরবল্লভের গা কাঁপিল। সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের সব মন্ত্র ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যাহ্নিক ভাল হইল না।

রঙ্গরাজ জঙ্গলে সাহেবকে লইয়া গিয়া বলিল, "আমরা কাহাকেও ফাঁসি দিই না। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমাদের পিছনে আর লেগো না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। সাহেব বিস্ময়াপন্ন হইল—রঙ্গরাজ বলিল, "সাহেব! রঙ্গপুর অনেক পথ, যাবে কি প্রকারে?"

সাহেব। যে প্রকারে পারি।

রঙ্গ। নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়া ঘোড়া কেন—নয় পাল্কী কর। তোমাকে আমাদের রাণী একশত মোহর পথখরচ দিয়াছেন।

রঙ্গরাজ মোহর গণিয়া দিতে লাগিল। সাহেব পাঁচ খান মোহর লইয়া আর লইল না। বলিল, "ইহাতেই যথেষ্ট হইবে।"

সাহেব চলিয়া গেল, রঙ্গরাজ পাল্কী বেহারার সন্ধানে গেল। তার প্রতি সে আদেশও ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

এদিকে ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে দেবীর কাছে আসিয়া বসিল।

দেবী বলিল, "তুমি প্রাণ রাখিতে হুকুম দিয়াছিলে, তাই প্রাণ রাখিয়াছি। দেবী মরিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী আর নাই। কিন্তু প্রফুল্ল এখনও আছে। প্রফুল্ল থাকিবে, না দেবীর সঙ্গে যাইবে?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে! তুমি না যাও—আমি যাইব না।"

প্র। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্রজ। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ করিয়া তাঁকে আগে পাঠাইয়া দাও। আমরা পশ্চাৎ যাইব।

প্র। পাল্কী বেহারা আনিতে গিয়াছে।

পাল্কী বেহারা শীঘ্রই আসিল। হরবল্লভও সন্ধ্যাহ্নিক সংক্ষেপে সারিয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, নিশি ঠাকুরাণী ক্ষীর, ছানা, মাখন ও উত্তম সুপক্ক আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল তাঁহার জলযোগের জন্য সাজাইতেছে। নিশি অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে জলযোগে বসাইল। বলিল, "এখন আপনি আমার কুটুম্ব হইলেন জলযোগ না করিয়া যাইতে পারিবেন না।"

হরবল্লভ জলযোগে না বসিয়া বলিল, "ব্রজেশ্বর কোথায়?"

নিশি। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। সেই কথাটা তাঁকে বলিয়া যাউন।

হরবল্লভ জলযোগে বসিল। নিশি ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু হে, তুমি যে এখানে কি প্রকারে আসিলে, আমি ত তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। তা যাক্—সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে হবে। এক্ষণে আমি একটু অনুরোধে পড়েছি—তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে। এই ঠাকুরাণীটি সৎকুলীনের মেয়ে—ওঁর বাপ আমাদেরই পালটি—তা ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—পাত্র পাওয়া যায় না—কুল যায়। তা

কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ। তাই আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।"

ব্রজেশ্বর মোটের উপর বলিল, "যে আজ্ঞা।"

নিশির বড় হাসি পাইল, কিন্তু হাসিল না। হরবল্লভ বলিতে লাগিলেন, "তা আমার পাল্কী বেহারা এসেছে, আমি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করি, যথাশাস্ত্র বিবাহ করে বৌ নিয়ে বাড়ী যেও।"

ব্রজ। যে আজ্ঞা।

হরবল্লভ জলযোগ সমাপন করিয়া বিদায় লইলেন। ব্রজ ও নিশি তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি পাল্কীতে চড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া, দুর্গানাম করিয়া প্রাণ পাইলেন।

হরবল্লভ চলিয়া গেলেন, ব্রজেশ্বর নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি ছল? তোমার ছোট বোন কে?"

নিশি। চেন না? তার নাম প্রফুল্ল।

দশম পরিচ্ছেদ

তখন ভূতনাথ যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রঙ্গরাজকে ডাকিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল, কতক নিশি বুঝাইল, কতক প্রফুল্ল নিজে বুঝাইল। রঙ্গরাজ কাঁদিল—বলিল, "মা, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন, তা ত কখনও জানিতাম না।" সকলে মিলিয়া রঙ্গরাজকে সান্ত্বনা করিল। দেবীগড়ে প্রফুল্লের ঘরবাড়ী, দেবসেবা, দেবত্র সম্পত্তি ছিল। সে সকল প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে দিলেন; বলিলেন,—"সেইখানে গিয়া বাস কর। দেবতার ভোগ হয়, প্রসাদ খাইয়া দিনপাত করিও। আর কখনও লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গালাঠি দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন। তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও, কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও। এই সকল কথাগুলি আমার পক্ষ হইতে ভবানী ঠাকুরকেও বলিও। তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও।"

রঙ্গরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইল। দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্য্যন্ত চলিল। সেই বজরায় ফিরিয়া তাহারা দেবীগড়ে গিয়া বাস করিবে, প্রসাদ খাইবে, আর হরিনাম করিবে। বজরায় দেবীর রাণীগিরির আসবাব সব ছিল, পাঠক দেখিয়াছেন, তাহার মূল্য অনেক টাকা। প্রফুল্ল সব দিবা ও নিশিকে দিলেন। বলিলেন, "এ

সকল বেচিয়া যাহা হইবে, তাহার মধ্যে তোমাদের যাহা প্রয়োজন, ব্যয় করিবে। বাকী দরিদ্রকে দিবে। এ সকল আমার কিছুই নয়। -- আমি ইহার কিছুই লইব না।" এই বলিয়া প্রফুল্ল আপনার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারগুলি নিশি ও দিবাকে দিলেন।"

নিশি বলিল, "মা নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ী উঠিবে ?"

প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের ভাল। আর আভরণে কাজ কি, মা ?"

যথাকালে বজরা ভূতনাথের ঘাটে পৌঁছিল। সেইখানে দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায় লইলেন। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বজরায় ফিরিয়া যথাকালে দেবীগড়ে পৌঁছিল। দাঁড়ি-মাঝি বর্‌কন্দাজের বেতন হিসাব করিয়া দিয়া তাহাদের জবাব দিল। বজরাখানি রাখা অকর্ত্তব্য—চেনা বজরা। প্রফুল্ল বলিয়া দিয়াছিলেন, "উহা রাখিও না।" নিশি বজরাখানি চেলা করিয়া দুই বৎসর ধরিয়া পোড়াইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভূতনাথের ঘাটে প্রফুল্লের বজরা ভিড়িবামাত্র, কে জানে কোথা দিয়া, গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, ব্রজেশ্বর আবার একটি বিয়ে করে এনেছে, বড় না কি ধেড়ে বৌ। সুতরাং ছেলে বুড়ো, কাণা খোঁড়া যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল।

বর-কন্যা আসিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছে, গিন্নী বরণ করিতেছেন। বৌয়ের মুখ দেখিবার জন্য লোক ঝুঁকিয়াছে, কিন্তু বৌ, বৌগিরির চাল ছাড়ে না, দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছে ; কেহ মুখ দেখিতে পায় না। শাশুড়ী বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন। একটু চমকিয়া উঠিলেন, আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "বেশ বৌ।" তাঁর চোখে একটু জল আসিল।

প্রতিবাসিনীরা অপ্রসন্ন হইয়া নিন্দা করিতে করিতে ঘরে গেল।

গোলমাল মিটিয়া গেল ; গিন্নী বিরলে ব্রজেশ্বরকে ডাকিলেন। ব্রজ আসিয়া বলিল, "কি মা ?"

গিন্নী। এ বৌ কোথা পেলে, বাবা ?

ব্রজ। এ নূতন বিয়ে নয়, মা।

গিন্নী। এ হারাধন আবার কোথায় পেলে, বাবা ?

গিন্নীর চোখে জল পড়িতেছিল।

ব্রজ। মা, বিধাতা দয়া করিয়া আবার দিয়াছেন। এখন মা, তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নির্জ্জনে পাইলে আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।

গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। এ কঠিন কাজের ভার মা লইলেন। ব্রজ বাঁচিল। কাহাকে কিছু বলিল না।

পাকস্পর্শের পর গিন্নী আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বলিলেন যে "এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বউ।"

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন "তবে লোকের কাছে নূতন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক্।"

গিন্নী বলিলেন "তাই থাকিবে।"

গিন্নী ব্রজেশ্বরকে সুসংবাদ জানাইলেন।

ব্রজ হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লকে খবর দিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিল।

ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া গিন্নী সাগরকে আনিতে পাঠাইলেন। যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে।

সাগরের বড় ঘৃণা হইল—ছি!

এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্ণভাবে সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিল।

আসিয়াই প্রথমে নূতন সপত্নীকে খুঁজিয়া, সাগর তাহাকে পুকুর-ঘাটে ধরিল।

প্রফুল্ল পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিল। সাগর পিছনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তুমি আমাদের নূতন বৌ?"

"কে, সাগর এয়েছ?" বলিয়া নূতন বৌ সমুখ ফিরিল। সাগর দেখিল, কে। বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী রাণী?"

প্রফুল্ল বলিল, "চুপ্, দেবী মরিয়া গিয়াছে।"

সাগর। প্রফুল্ল?

প্র। প্রফুল্লও মরিয়াছে।

সা। কে তবে তুমি?

প্র। আমি নূতন বৌ।

সা। কেমন করে কি হলো, আমায় সব বল দেখি ?

প্র। আমি একটি ঘর পাইয়াছি, সেইখানে চল, সব বলিব।

দুইজনে দ্বার বন্ধ করিয়া, বিরলে বসিয়া, কথোপকথন হইল। প্রফুল্ল সাগরকে সব বুঝাইয়া বলিল।

শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে ? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে ? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে ? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মার হুকুমবর্দারি কি তার ভাল লাগিবে ?"

প্রফুল্ল। ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। রাজত্ব—স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম ; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস্ কঠিন ? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য ? আমি এই সন্ন্যাস্ করিব।

সা। তবে কিছুদিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষে প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না। দেখিল, নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না।—আবার আসিল প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।

এদিকে সংসারে প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া, দিন দিন লক্ষ্মীশ্রী বাড়িতে লাগিল। শেষে যথাকালে ধন জন ও সর্ব্বসুখে পরিবৃত হইয়া হরবল্লভ পরলোকে গমন করিলেন।

বিষয় ব্রজেশ্বরের হইল। প্রফুল্লের গুণে ব্রজেশ্বরের নূতন তালুক-মুলুক হইয়া হাতে অনেক নগদ টাকা জমিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ শোধ কর।"

ব্র। কেন, তুমি টাকা লইয়া কি করিবে?

প্র। আমি কিছু করিব না, কিন্তু টাকা আমার নয়—শ্রীকৃষ্ণের ঃ কাঙ্গাল-গরিবের ; কাঙ্গাল-গরিবকে দিতে হইবে।

ব্র। কি প্রকারে?

প্র। পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক অতিথিশালা কর।

ব্রজেশ্বর তাই করিল। অতিথিশালার মধ্যে এক অন্নপূর্ণামূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, অতিথিশালার নাম দিল "দেবী-নিবাস।"

যথাকালে পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক সকলেই বলিল, "আমরা মাতৃহারা হইলাম।"

রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি দেবীগড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদভোজনে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। ভবানী ঠাকুরের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিল না।

ইংরেজ রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ডাকাইতি সব বন্ধ করিল।

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিল, সকল ডাকাইতি একরার করিল, দণ্ডের প্রার্থনা করিল। ইংরেজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস।" ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।

এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি,—আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র। কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। তাই আবার আসিলাম।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সমাপ্ত
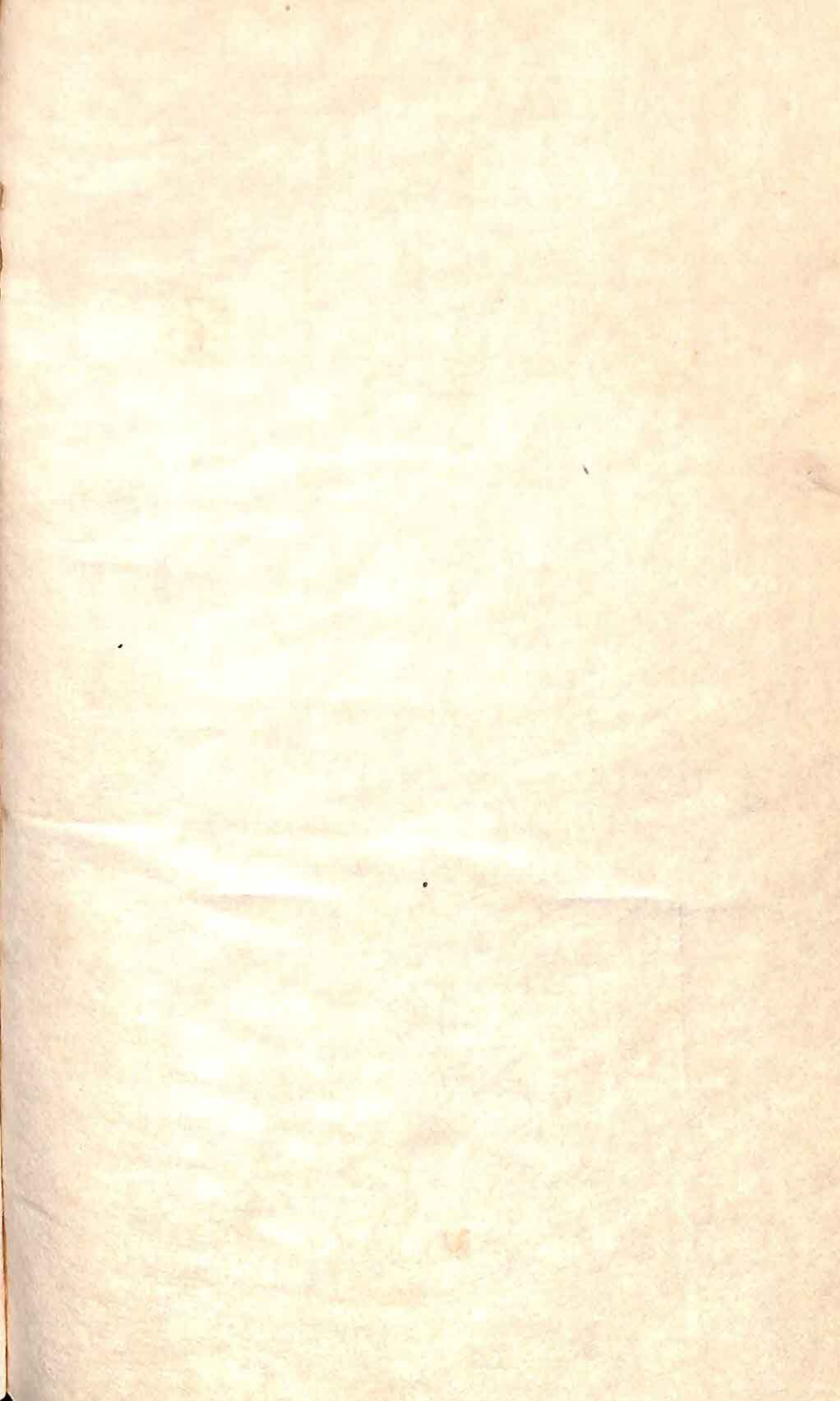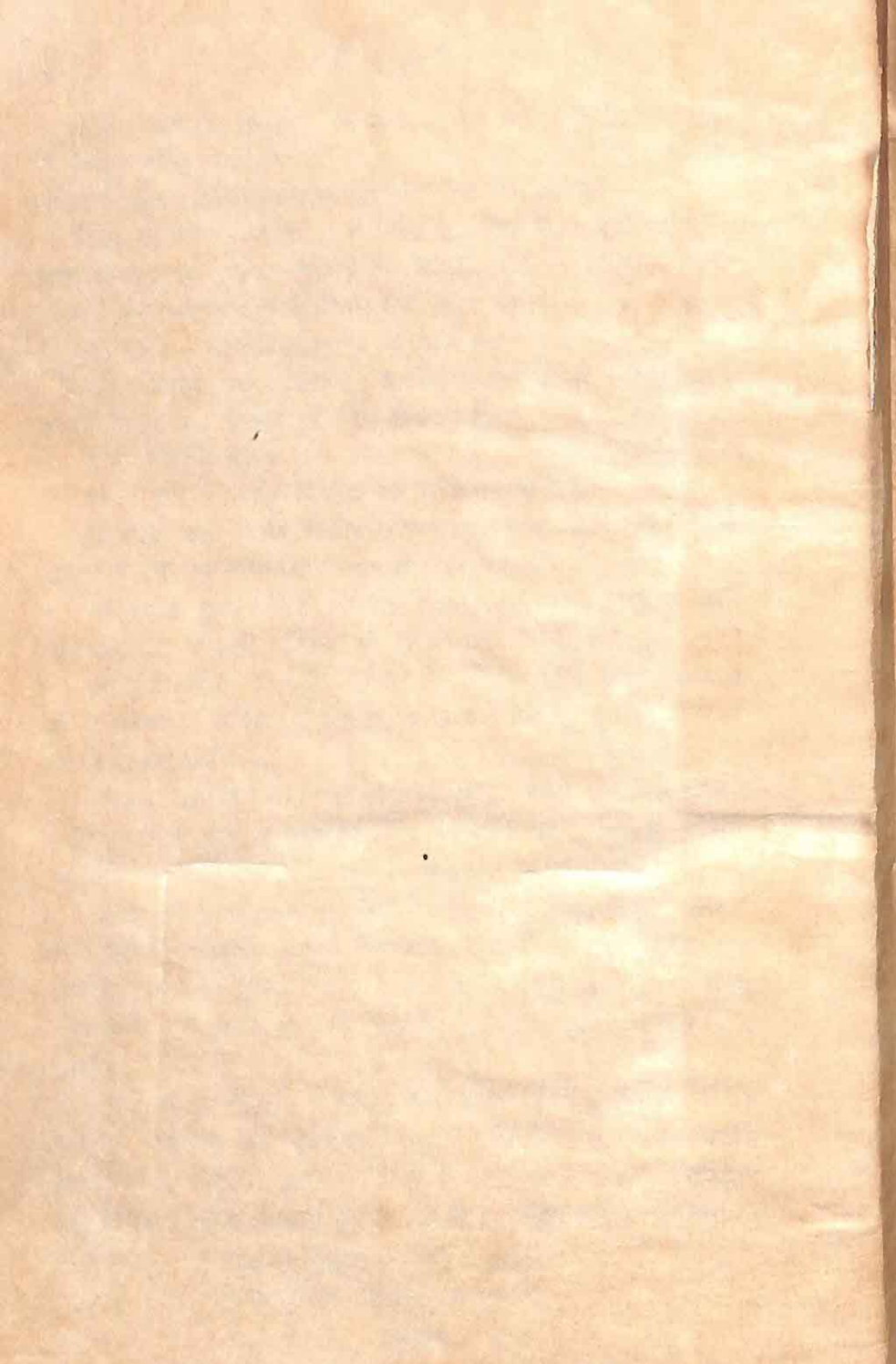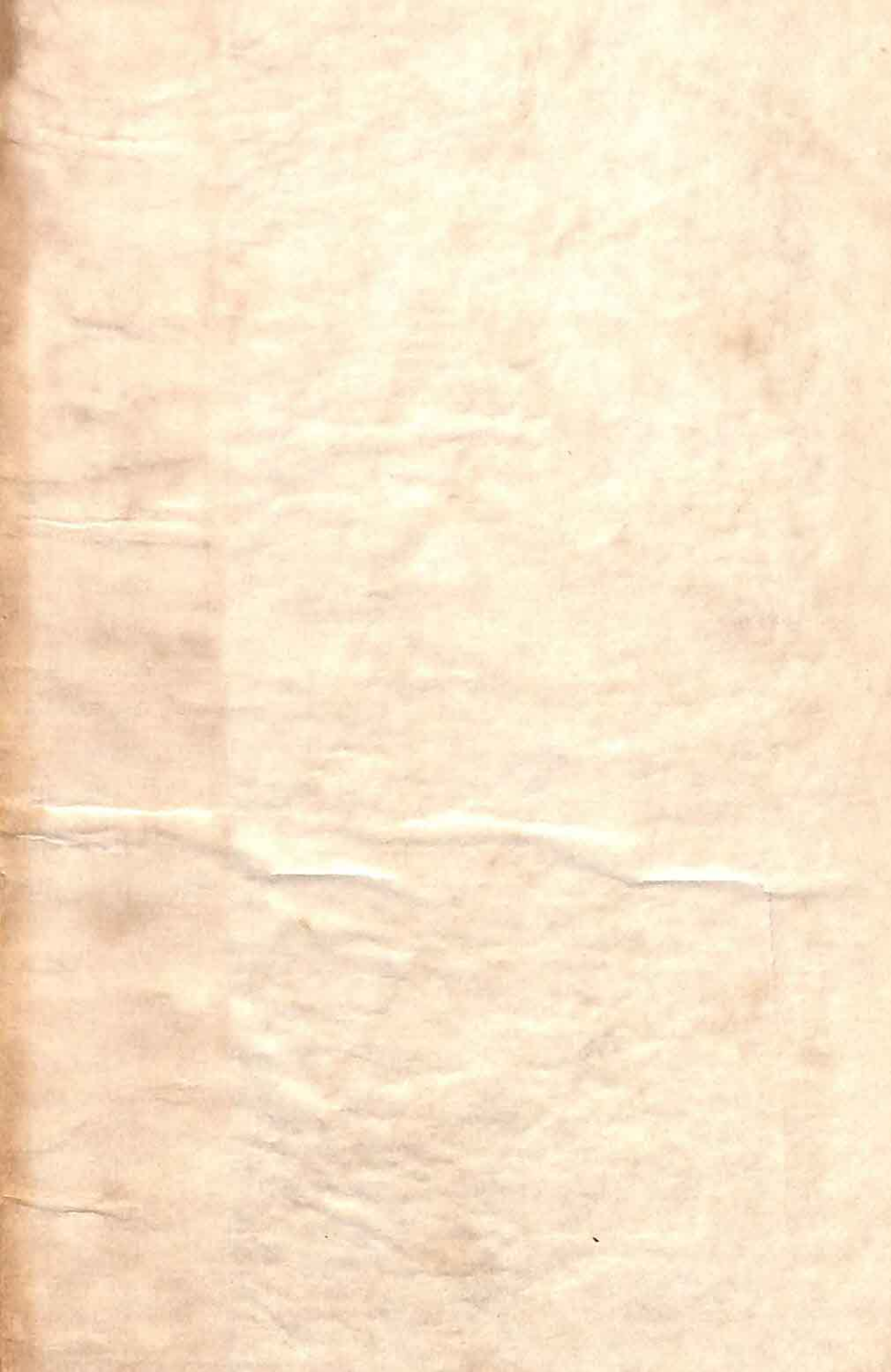
বিশ্ব প্রতিভা সিরিজ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ
২। ঋষি অরবিন্দ
৩। রাষ্ট্রনেতা জহরলাল
৪। যাদুকর মার্কনী
৫। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস
৬। এব্রাহাম লিন্‌কলন্
৭। দ্বাদশ সূর্য্য

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৮। সত্যাশ্রয়ী বাপুজী
৯। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ
১০। বলদর্পী হিটলার
১১। মহাপুরুষ আশুতোষ
১২। মহামনীষী জর্জ বার্ণার্ডশ

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১৩। ছোটদের হজরত

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৪। নেতাজী সুভাষ

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৫। দানবীর কার্ণেগী
১৬। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৭। ভগবানের চাবুক
১৮। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৯। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

রবিদাস সাহারায় প্রণীত

২০। আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা
২১। আমাদের বাপুজী
২২। আমাদের নেতাজী
২৩। আমাদের রবীন্দ্রনাথ
২৪। আমাদের শ্রীমা সারদামণি
২৫। আমাদের রামমোহন রায়
২৬। আমাদের বিদ্যাসাগর
২৭। আমাদের চিত্তরঞ্জন
২৮। ভগিনী নিবেদিতা
২৯। যুগাবতার রামকৃষ্ণ
৩০। আমাদের লেনিন
৩১। আমাদের শরৎচন্দ্র
৩২। মাদার টেরেসা

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৩। বিপ্লবী স্ট্যালিন

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

৩৪। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

৩৫। আমাদের লোকমান্য তিলক
৩৬। লালা লাজপত রায়
৩৭। আমাদের লালবাহাদুর

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

৩৮। জনসেবক বিধানচন্দ্র

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৯। আমাদের সর্দার প্যাটেল

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৪০। আইনস্টাইন

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ কলিঃ-৯